৭১ এর যুদ্ধে পাকিস্তান ভারত ও বাংলাদেশ

দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা একাডেমী : ঢাকা
বাংলা একাডেমী : ঢাকা

ডিসেম্বর, ১৯৭২

বাএ ৯৮৭

পাণ্ডুলিপি : অনুবাদ বিভাগ,
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

প্রকাশক
ফজলে রাব্বি
পরিচালক
প্রকাশন-মুদ্রণ-বিক্রয় বিভাগ,
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মুদ্রাকর
এস. খান
শাহজাহান প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৯৭/২, সিদ্দিক বাজার, ঢাকা—২

প্রচ্ছদ : কাইয়ুম চৌধুরী

গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলা দেশের

রাষ্ট্রপতি

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের করকমলে

শান্তির প্রতীক শ্বেত পায়রা হাতে বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমান
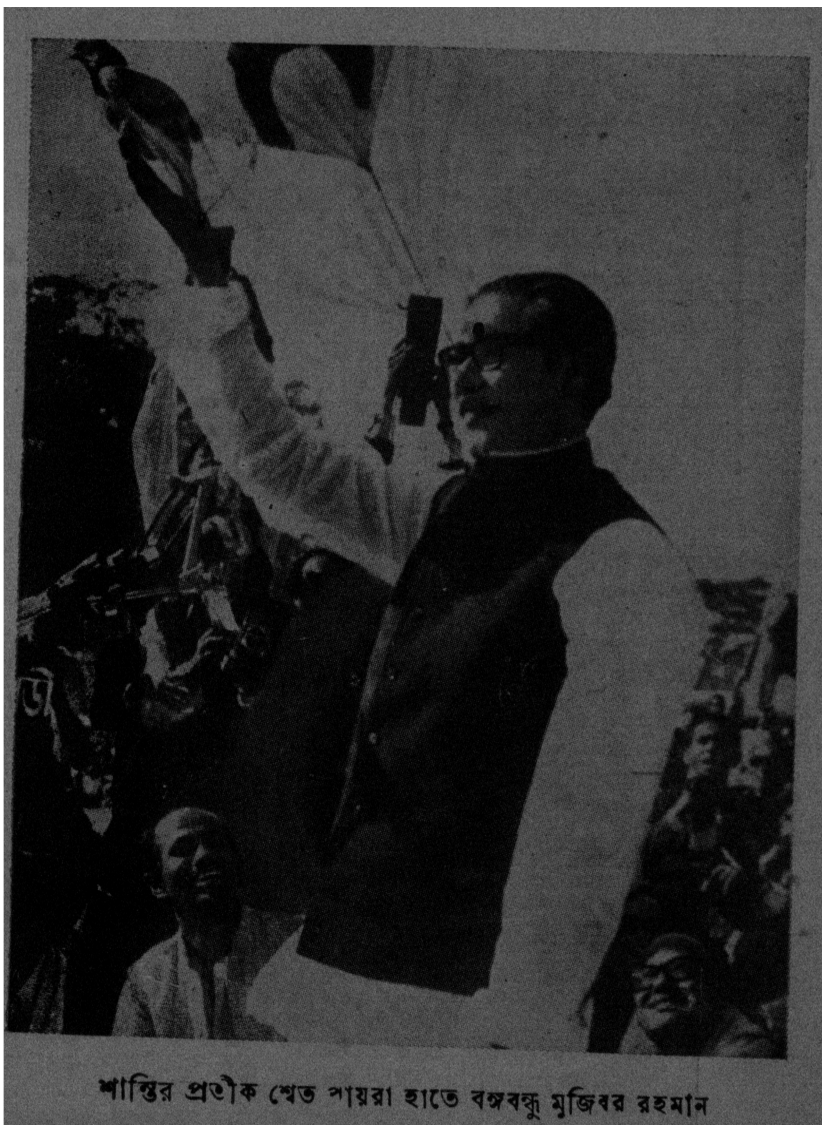
Are they freedom fighters?

পায়ে নেই জুতো, পরনে নেই পোষাক, তবু গাঁয়ের সাধারণ ছেলেরা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে রণাঙ্গনে।

রাজসাহী রণাঙ্গণে পাকসৈন্যের মুকাবিলায় অপেক্ষমান মুক্তি-সেনা।
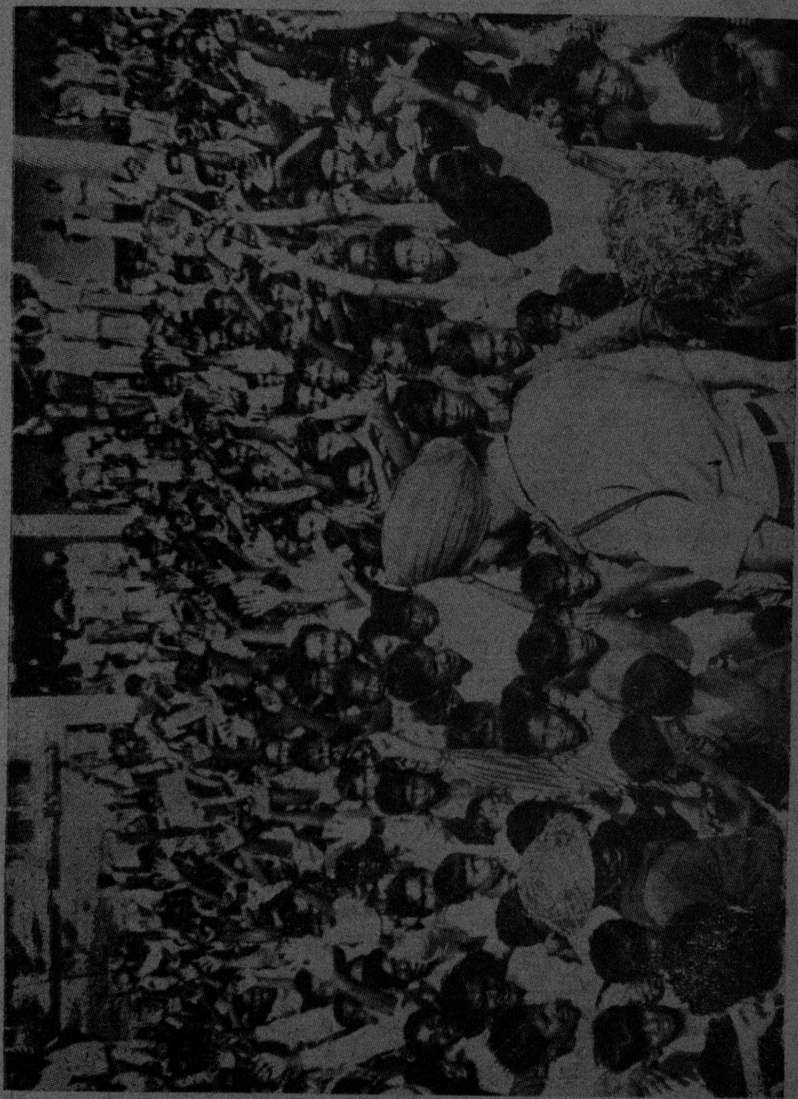
যশোরের পতনের পর গণসম্বর্ধনায় লেঃ জেঃ অরোরা

ইকবাল হলে নিহত বাংলাদেশের ছাত্রশহিদ
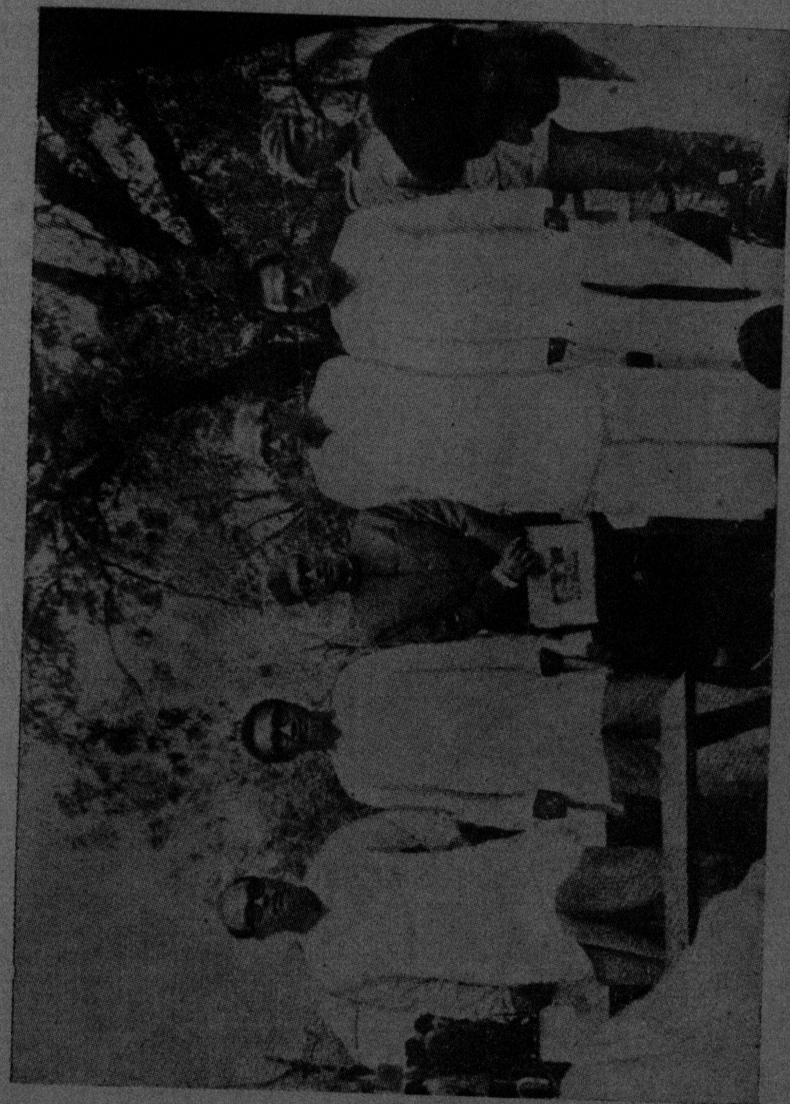
মন্ত্রীপরিষদ সহ স্বাধীন বাংলার অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি
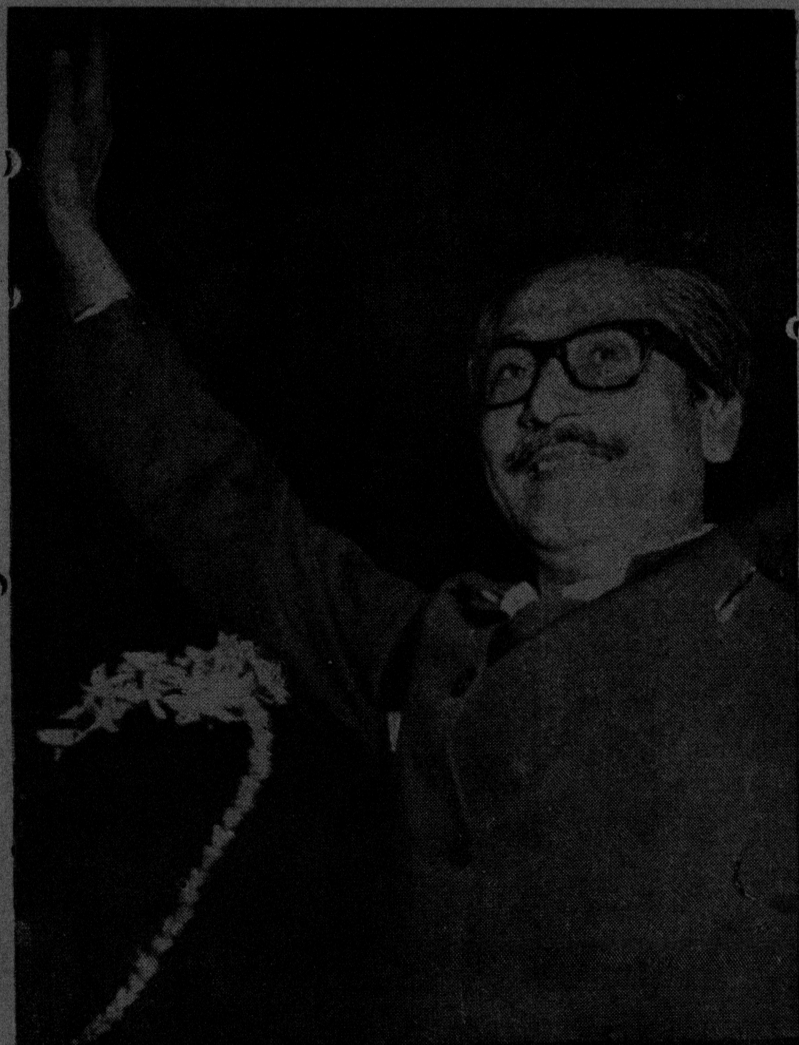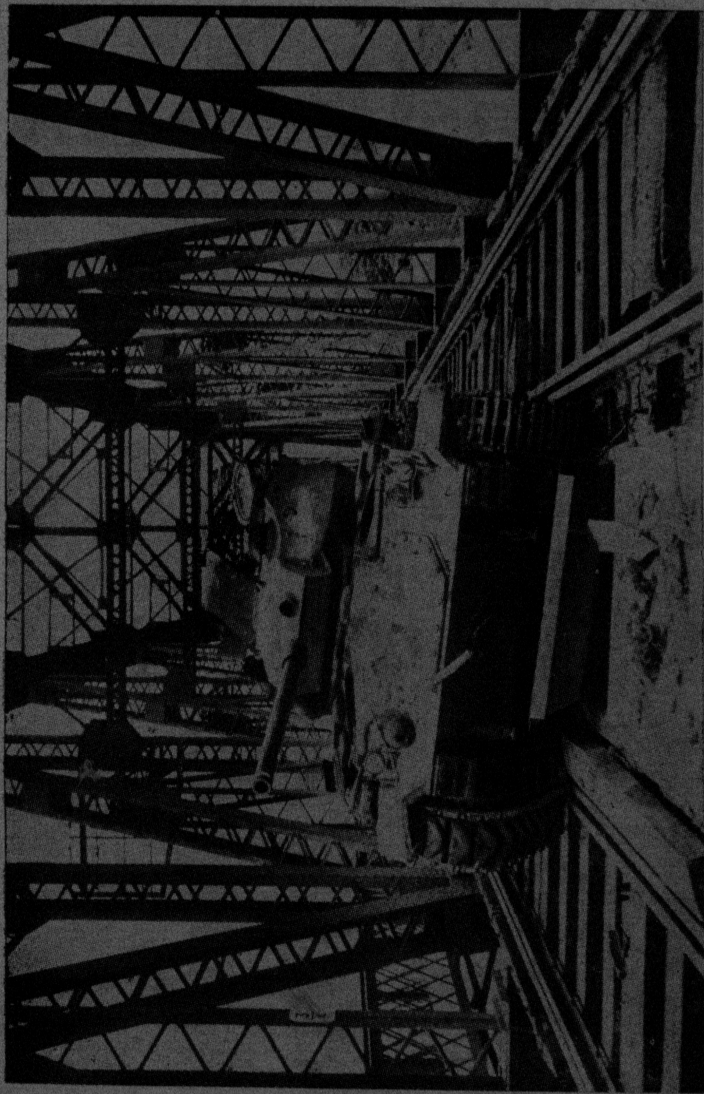
হার্ডিনজ ব্রিজের ওপরে বিধ্বস্ত পাকিস্তানী ট্যাংক
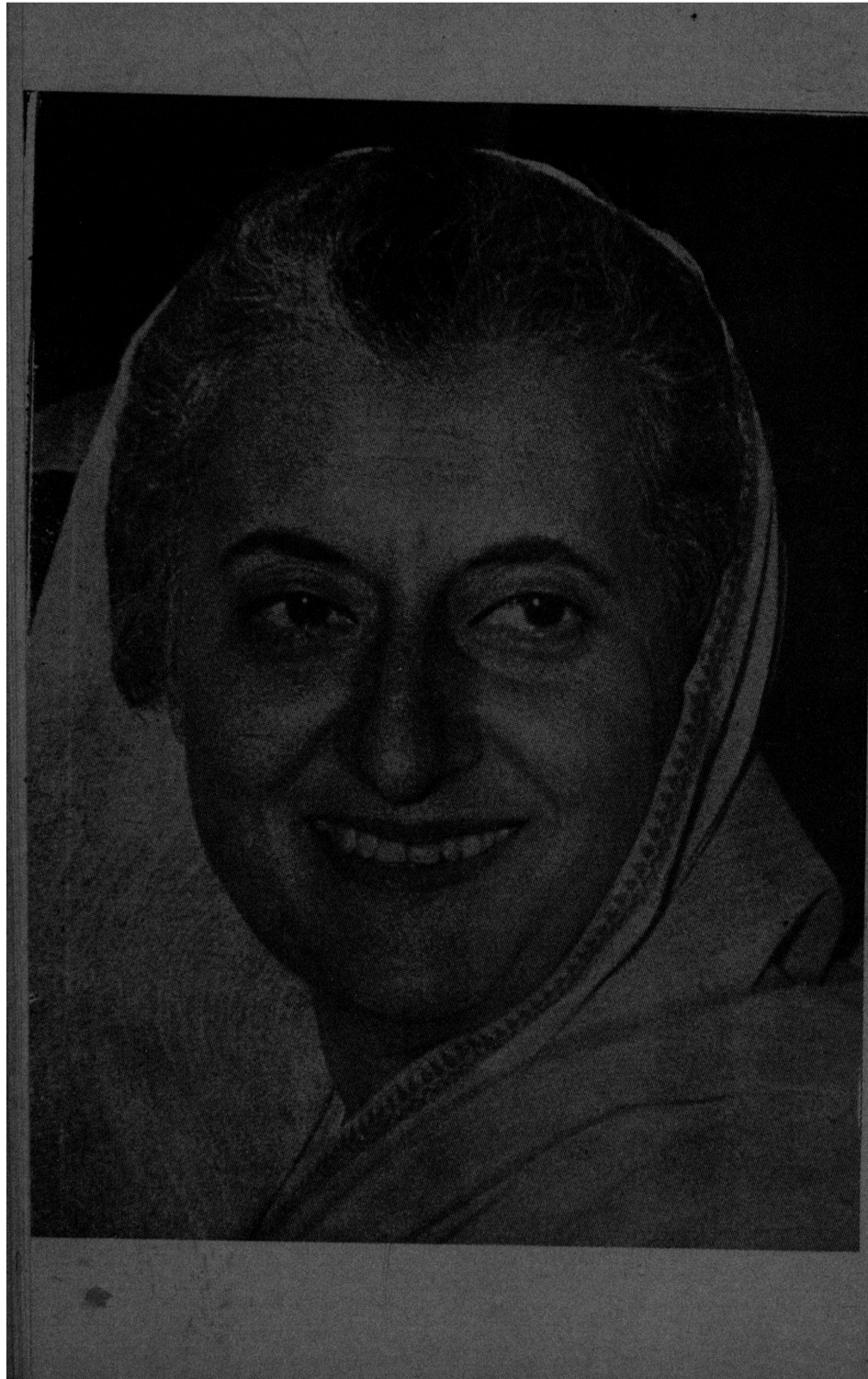
না চাইলেও যুদ্ধ হতে পারে

পান্নালাল দাশগুপ্ত

ভারত সরকার বাংলা দেশের ব্যাপারে "যুদ্ধ" কথাটা ভারতবাসীদের মুখ থেকে শুনতে চান না। কোন কথা তুলতে গেলে প্রথমেই তাঁরা একটা সীমানা টেনে দেন—যুদ্ধ চলবে না। কিন্তু পাকিস্তান নিজের গরজেই কোন যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারে না, এমন কথাটি বলা যায়? ওরা প্রতিদিন সীমান্তের এপারে গোলাগুলি নিক্ষেপ করছে, সীমান্ত বরাবর ভারতীয় বাসিন্দারাও সীমান্ত ত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছে, প্ররোচনার অন্ত নেই তাদের পক্ষ থেকে।

রাত্রিদিন পাকিস্তান তার অস্ত্রশস্ত্রের সম্ভার অফুরন্ত করার জন্য লেগে আছে। প্রতিরক্ষার জন্য কন্‌ক্রিটের বাংকার তৈরী করে নিচ্ছে। ওদের ফায়ার-পাওয়ার প্রচণ্ড বাড়িয়ে চলেছে। চীন বিনামূল্যে অকাতরে অস্ত্রশস্ত্র দিয়েই চলেছে। আরও দুটি ডিভিশন তৈরী করার জন্য যাবতীয় অস্ত্রশস্ত্র কারাকোরাম গিরিপথ দিয়ে পাঠিয়েছে। আরও পাঠাচ্ছে। চীন যাদেরই অস্ত্রশস্ত্র দেয়—বিনামূল্যে দিয়ে থাকে। অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবসা তারা করে না বলে নৈতিক বাহাদুরি তারা নিয়ে থাকে; ব্যাপারটা যদিও অমন নৈতিক ও বৈপ্লবিক নয়, অত্যন্ত ব্যবহারিক স্বার্থেই চীন পাকিস্তানকে অস্ত্র যোগান দিয়ে চলেছে। কেননা চীনের জিও-পলিটিক্যাল স্বার্থেই ভারত-ভূখণ্ডে একটা চিরন্তন যুদ্ধবিগ্রহ সৃষ্টি করে রেখে ভারত ও পাকিস্তান উভয়কেই জখম করে রাখা তার উদ্দেশ্য। চীন কি জানে

না ইয়াহিয়া শাসনের প্রতিক্রিয়াশীলতা, স্বৈরাচার, ধর্মান্ধতা ইত্যাদি? চীন কি জানে না ভারত পাকিস্তানের তুলনায় ঢের বেশী প্রগতিবাদী? চীন কি জানে না বাংলা দেশের রাজনৈতিক আদর্শ প্রগতিশীল? সব জানে, কিন্তু তাদের বিচারে ঘোর প্রতিক্রিয়াশীল পাকিস্তান তেমন ভয়ের কারণ নয়, প্রগতিশীল বা প্রগতিবাদী ভারত ও বাংলা দেশ তার চেয়ে ঢের বেশী ভয় ও ভাবনার কারণ। কেননা ইংরেজীতে যাকে বলে Better is the enemy of good, and Best is equally a bitter enemy of Better, গণতন্ত্র চীনের পক্ষে একটা চ্যালেঞ্জ, পাছে লোকেরা ভারত ও বাংলা দেশের আদর্শে বিভ্রান্ত হয় সেই হেতু ভারত ও বাংলা দেশকে পাকিস্তানের চেয়ে চীনারা বড় শত্রু বলে মনে করে। কাজেই এই যুদ্ধটাকে তারা নিজেদেরই যুদ্ধ বলে মেনে নিয়েছে—যদিও এটা চীনের যুদ্ধ but by proxy. কাজেই বিনামূল্যে অকাতরে অস্ত্রশস্ত্র পাকিস্তানকে দিয়ে যেতে চীনের আপত্তি নেই। আর পাকিস্তান তাতে শক্ত হবে? মোটেই না। কেননা চীনারা জানে পাকিস্তানের ভিত এত দুর্বল যে নিজের ভিতরকার গ্লানি ও বিস্ফোরণেই যে কোন দিন শেষ হয়ে যাবে। পাকিস্তানকে নিয়ে তাই চীনের কোন ভাবনা নেই, ভাবনা ভারতকে নিয়ে। ভারতকেই চীন তার এশিয়ার সত্যিকার প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে। কাজেই পাকিস্তানকে চীন সংযত করবে একথা মনে করার কারণ নেই, বরং ক্রমবর্ধমান শত্রুতা করতে উসকানি দিয়ে যাবে, এমন কি যুদ্ধও বাধিয়ে দিতে বলতে পারে।

চীন আরব-উপসাগরে ও বঙ্গোপসাগরের উপরে যদি কোন আধিপত্য রক্ষা করতে চায় তবে পশ্চিম ও পূর্ব উভয় পাকিস্তানের উপরেই তার হাত থাকা চাই। এ হিসেবে পূর্ববাংলাকে চীন হাতছাড়া করতে পারে কি? তাছাড়া কোনদিন যদি চীন-ভারত যুদ্ধ হয়, তখন পূর্ব ভারতের পিছনটাতেই যদি পূর্ব বাংলা একটি ভারতবিরোধী শক্তি হিসেবে দাঁড়িয়ে থাকে, তবে পূর্ব ভারতে

ভারতীয় প্রতিরক্ষার কোন প্রতিরক্ষা-সুরক্ষিত বিস্তৃত পশ্চাৎভূমি থাকবে না। পশ্চিম বাংলা থেকে আসামের সঙ্গে যে ৩০।৩৫ মাইল প্রস্থের সংযোগভূমি বর্তমান তার মধ্যে কোনই প্রতিরক্ষার বেস তৈরী করা সম্ভব নয়। কিন্তু যদি আজ বাংলাদেশ পকিস্তান থেকে মুক্ত হয় এবং ভারতের সঙ্গে বন্ধুভাবাপন্ন একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে দাঁড়ায়, তবে ভারতের পক্ষে তার কোনই অভাব হয় না এবং আসামের সঙ্গে সংযোগও বিপন্ন হয় না। সেক্ষেত্রে বঙ্গোপসাগরের উপর কোন কর্তৃত্ব স্থাপন করার স্বপ্ন চীনের পক্ষে সুদূরপরাহত হয়। অতএব চীন সহজে কি বাংলা দেশকে স্বাধীন হতে দিতে পারে—যদি না সে বাংলা দেশ তাদেরই (চীনেরই) সাহায্যে ও সমর্থনে স্বাধীনতা পায়? চীন হিমালয় অতিক্রম করে হাজার হাজার সৈন্য নিয়ে গাঙ্গেয় উপত্যকায় অথবা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় সশরীরে নেমে আসবে না, কেননা তার বিপদ অনেক, তার সাপ্লাই লাইন অসম্ভব হতে বাধ্য। কিন্তু তিব্বতে অবস্থিত বিমানঘাটি থেকে উত্তর ভারতের যে-কোন শহরের উপর বোমা ফেলার মত বিমান বহর তার আছে, অথচ ভারতীয় বিমান বহরের চীনের শহরগুলির উপর পালটা বোমা ফেলার সুবিধা নেই—কেননা সেগুলি সবই প্রায় সুদূর উত্তর চীনে বা মধ্যচীনে। চীনা বিমান বহর ভারতীয় শহরের উপর বোমা ফেলে দিয়ে আধ ঘণ্টার মধ্যেই তাদের ঘাঁটিতে ফিরে যেতে পারবে। চীনের দিক থেকে যুদ্ধের আশঙ্কার এই একটিই মাত্র কারণ হতে পারে, নইলে তার সৈন্যবলটা প্রকৃতপক্ষে ভারতের কোনই বিপদের কারণ নয়। এই সৈন্যবলের কাজটা চীন পাকিস্তানী সৈন্যদের দিয়েই করাতে চায়—নিজের একটি সৈন্যকেও চীন অযথা বিপদের মুখে ফেলবে না হয়তো। পাকিস্তান এ জন্যও চীনের এত প্রিয়। একথা আজ সর্বজনবিদিত যে ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের পরে চীন পাকিস্তানকে ২০০ ট্যাঙ্ক ও ১০০ মিগ বিমান দিয়েছে।

মারকিন সাম্রাজ্যবাদও পাকিস্তানকে নিরস্ত্র করছে না, বরং আরও সশস্ত্র করছে। ইতিহাসের এমনি নিষ্ঠুর পরিহাস আজ বাংলা দেশের জনগণের উপরে যে গুলিগোলা বর্ষিত হচ্ছে তা চীন ও আমেরিকা উভয়েরই একসঙ্গেই দেওয়া। বিপ্লবী চীন ও সাম্রাজ্যবাদী মারকিন উভয়েরই দান—বাংলা দেশের পক্ষে একই জাতীয়। ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশগুলিও ভারত ভূখণ্ডে শক্তিসাম্য রাখতে বদ্ধপরিকর, ভারত ও বাংলা দেশকে অতিরিক্ত শক্তিমান হতে দিতে নারাজ। রাশিয়ার কার্যকলাপ ও চিন্তাধারাও এর চেয়ে খুব পৃথক —এমন কোন প্রমাণ আজও পাওয়া যায়নি। এই দোদুল্যমান পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে পাকিস্তান যে আরও এক পা অগ্রসর হবে না, ভারতকেই আক্রমণ করে বসবে না, তার নিশ্চয়তা কোথায়? তাছাড়া বাংলা দেশের অভ্যন্তরে মুক্তিফৌজ যদি খুবই শক্তিমান হয়ে ওঠে এবং মুক্তিফৌজেরা ভারত ও বাইরে থেকে সাহায্য পেতেই থাকে—তবে নিজের প্রজাদের কাছে হেরে যাবার চেয়ে ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ করে হারা শ্রেয় মনে করবে। এ ক্ষেত্রে আক্রমণই আত্মরক্ষার সবচেয়ে ভাল উপায়। একটা কোন যুদ্ধ বাধিয়ে দিলে যুক্ত জাতিসঙ্ঘের সিকিউরিটি কাউন্সিল এসে উপস্থিত হবে এবং এমন এক জায়গায় যুদ্ধবিরতি সীমারেখা টেনে দেবে সিকিউরিটি কাউন্সিল যা মানতে গিয়ে পাকিস্তানের মুখরক্ষা হয়তো হয়ে যাবে।

পাকিস্তান কোথায় প্রথম ভারতকে আক্রমণ করতে পারে? হয়তো ত্রিপুরা রাজ্যটির উপর। ত্রিপুরা রাজ্যটি পাকিস্তানের ভিতরে একটা প্রতিকূল সশস্ত্র গোঁজ হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। চট্টগ্রামের বন্দর থেকে ঢাকার রেল ও রোডের যাতায়াত পথ ত্রিপুরায় অবস্থিত ভারতীয় কামানের পাল্লার মধ্যে। পূর্ব বাংলার অনেকগুলি শহর ত্রিপুরার ঘাঁটিগুলির আক্রমণের মধ্যেই অবস্থিত। মুক্তিফৌজেরাও ত্রিপুরার ঘাঁটিগুলিকে অবাধ আক্রমণের কাজে ব্যবহার

করতে পারছেন। অথচ ত্রিপুরার তিন দিকেই পাকিস্তান। পাকিস্তান সামরিক বাহিনী ত্রিপুরাকে কাছাড় থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবার জন্য একটা প্রচণ্ড আক্রমণ করতেও পারে। ত্রিপুরার সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত দুর্বল। তার বিমান ঘাঁটিগুলি যুদ্ধের প্রথম মুহূর্তেই ভারতের পক্ষে অব্যবহার্য হয়ে পড়বে। কাছাড় থেকে রেলপথ ধর্মনগর এসেই শেষ হয়েছে—ত্রিপুরার ভিতরে আর কোন রেলপথ করা হয়নি। যে কয়েকটি রোড করা হয়েছে তা বর্ষার সময় অনেক সময়ই ধসের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। অথচ ত্রিপুরা থেকে মুক্তিফৌজ ও ভারতীয় ফৌজদের চট করে পিছিয়ে আনাও সহজ নয়। সশস্ত্র ফৌজ ও সাধারণ নাগরিকেরা হঠাৎ মহাবিপদের মধ্যে পড়ে যেতে পারে—ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে।

অথচ আমরা যদি ত্রিপুরাকে হারাই সে ক্ষতি অন্য কোন উপায়ে পূরণ করা সম্ভব নয়। ত্রিপুরা থেকে ভারতীয় ফৌজ ও মুক্তিফৌজ পূর্ব বাংলার অনেক শহর ও যাতায়াত-পথ সহজেই দখল করে নিতে পারে। এই সুবিধাজনক পরিস্থিতিটা আমরা যেমন ছাড়তে পারি না, পাকিস্তানও তেমনি সহ্য করতে পারে না।

আকস্মিক আক্রমণের মুখে ত্রিপুরা কী করবে? যদি সত্যিই যুদ্ধ হয় তবে ত্রিপুরা সাময়িকভাবে কয়েকমাসের জন্য অন্তত ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। সেই বিচ্ছিন্ন অবস্থায় যদি সেখানে প্রতিরক্ষা বাহিনী ও মুক্তিফৌজের লড়াই করবার মত যথেষ্ট অস্ত্রশস্ত্র ও খাদ্যবস্ত্র মজুত না থাকে, তবে একটা চরম বিপর্যয় ঘটে যেতে পারে। কেবল ত্রিপুরার একটি দৃষ্টান্ত দিলাম, উত্তরবঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ —সর্বত্রই আমাদের আরও একটু সতর্ক ও প্রস্তুত থাকা উচিত নয় কি?

রাজনৈতিক সমাধান অনেকেই চান, কিন্তু কীভাবে?

বরুণ সেনগুপ্ত

রাশিয়া, ব্রিটেন এবং মারকিন যুক্তরাষ্ট্র এখন বাংলাদেশ সমস্যার একটা "রাজনৈতিক সমাধানের" জন্য বেশ সক্রিয় হয়ে উঠেছেন। এই তিনটি রাষ্ট্রেরই নানা ধরনের প্রতিনিধিরা সম্প্রতি এই উদ্দেশ্যে ইসলামাবাদ, দিললি এবং কলকাতা ছোটাছুটি শুরু করেছেন। "রাজনৈতিক সমাধানের নানা প্রস্তাব নিয়ে এরা সংশ্লিষ্ট নানাপক্ষের সঙ্গে আলোচনাও শুরু করেছেন। ইসলামাবাদ এবং দিললির সঙ্গে আলোচনাটা চলছে সরাসরি, মুজিবনগরের সঙ্গে কথাবার্তা হচ্ছে গোপনে এবং কখনও কখনও অপ্রত্যক্ষভাবে।

এই তিনটি রাষ্ট্রেরই প্রস্তাবঃ শেখ মুজিবরকে মুক্তি দেওয়া হোক। বাংলাদেশ নেতৃত্ব স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের দাবিতে অটল না থেকে পাকিস্তানের রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যেই যত দূর সম্ভব স্বায়ত্তশাসনের অধিকার নিয়ে একটা মীমাংসায় রাজি হয়ে যান। আর, ভারত সরকার সেই মীমাংসায় পৌঁছতে রাজি হওয়ার জন্য বাংলাদেশ নেতৃত্বকে "অনুরোধ" জানান।

এই "রাজনৈতিক সমাধানের" প্রস্তাব যে সবাই একসঙ্গে বা একই ভাষায় দিয়েছেন তেমন নয়। নানাজন নানাভাবে প্রস্তাবগুলি আনছেন। প্রস্তাবগুলির বিস্তারিত বিচারে গেলে হয়ত দেখা যাবে বেশ কিছু পার্থক্যও আছে। তবে সকলের প্রস্তাবেরই মূল সুরটা এক। মুজিবের মুক্তি সকলেরই প্রথম শর্ত। দ্বিতীয় শর্তেও সবাই একমত, পাকিস্তানকে ভাঙ্গা হবে না, অর্থাৎ পূর্ব বাংলা পাকিস্তান থেকে পুরোপুরি বেরিয়ে গিয়ে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হবে না। এবং

তৃতীয় শর্ত পূর্ব বাংলাকে যথা সম্ভব স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দিতে হবে।

পূর্ব বাংলার ভবিষ্যৎ রূপ কী হবে সে সম্পর্কে রুশরা বলছেন, যেমন কিছুদিন আগেও যুগোশ্লাভিয়ার রাষ্ট্রকাঠামোটা ছিল। যুগোশ্লাভিয়া কতকগুলি প্রজাতন্ত্রের (রিপাবলিকের) "স্বেচ্ছামিলনে" গঠিত রাষ্ট্র। প্রত্যেক প্রজাতন্ত্রের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারস্যাপার পরিচালনার পূর্ণ অধিকার তাঁদের প্রতিনিধিদের। পররাষ্ট্রনীতি, প্রতিরক্ষা এবং কারেনসি অর্থাৎ মুদ্রা ব্যবস্থা সব প্রজাতন্ত্র থেকে নিয়ে গঠিত সম্মিলিত প্রতিনিধিমণ্ডলী স্থির করবেন।

ব্রিটেনের বক্তব্য, শেখ মুজিবর রহমান যে ছয় দফা দাবির ভিত্তিতে নির্বাচন লড়েছিলেন সেইটাই আলোচনার ভিত্তি হতে পারে।

আমেরিকার বক্তব্য, যেখানে আলোচনা ভেঙ্গে গিয়েছিল অর্থাৎ ২৪ মারচ দু'পক্ষ যেখানে ছিলেন সেখান থেকেই আবার কথাবার্তা শুরু হোক।

তিন রাষ্ট্রই এই সঙ্গেই আরো বলছেন, উভয় পক্ষকে অবিলম্বে অস্ত্র সম্বরণও করতে হবে। অর্থাৎ একে অপরকে আক্রমণ করতে পারবেন না।

বাংলাদেশ সমস্যার "রাজনৈতিক সমাধানের" কথা এই তিন রাষ্ট্র বেশ কিছুদিন থেকেই বলে আসছেন। তবে এতদিন তাঁরা এ নিয়ে খুব বেশি উদ্যোগী হননি। এখন হয়েছেন। অন্তত, বাইরে থেকে তাই মনে হচ্ছে।

আমি তিন রাষ্ট্রেরই কয়েকজন কূটনৈতিক প্রতিনিধির সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলেছি। তাঁরা এতদিন তেমন কিছু করেননি, ইয়াহিয়ার উপর তেমন চাপ দেননি, হঠাৎ আজ এতটা ব্যগ্র কেন? সবাই বলেছেন, তাঁরা এখন পরিষ্কার বুঝছেন যে, অবিলম্বে যদি বাংলাদেশ সমস্যার "রাজনৈতিক সমাধানের" আলাপ-আলোচনা শুরু না হয়

তাহলে বাংলাদেশ ইস্যুতে পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে। তাঁরা সবাই বলছেন, যুদ্ধ তাঁরা কেউই চান না। এবং মনে করেন যে, এই যুদ্ধে ভারতীয় উপমহাদেশ এবং বিশ্বের যথেষ্ট ক্ষতি হবে।

একটা ব্যাপার খুব মজার, এই একটা ইস্যুতে রাশিয়া আমেরিকাকে এবং আমেরিকা রাশিয়াকে গালিগালাজ করছে না। আমি একান্ত আলোচনায় একজন রুশ প্রতিনিধিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম: আপনি কি মনে করেন, আমেরিকা বাংলাদেশ নিয়ে পাক-ভারত লড়াই বাধিয়ে দিয়ে নিজের উদ্দেশ্য হাসিল করতে চায়? তিনি জবাব দিয়েছিলেন: না, আমি মনে করি না আমেরিকা এখন পাক-ভারত যুদ্ধ চায়। তারা বরং সত্যিই এই যুদ্ধ এড়াতে চায়। কারণ, নিকসন জানেন, এখন পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হলে আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে তিনি যেসব পরিকল্পনা নিয়ে এগোচ্ছেন তার অনেকগুলিই বাতিল হয়ে যেতে পারে। পরবর্তী মারকিন প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনের আগ পর্যন্ত নিকসন বিশ্বের কোথাও কোনও নতুন গণ্ডগোল চান না। কারণ, তাঁর ভয়, তাহলে তিনি নির্বাচনে হেরে যাবেন। দ্বিতীয়বার প্রেসিডেণ্ট হতে পারবেন না।

রাশিয়া কি পাক-ভারত যুদ্ধ চায়? একজন মারকিন কূটনৈতিক প্রতিনিধিকে এই কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বললেন: কেন চাইবে? তাতে রাশিয়ার সুবিধার চেয়ে অসুবিধাই বেশি। তাকে খোলাখুলিভাবে বলতে হবে সে কোন্ পক্ষে। বললেও বিপদ, না বললেও বিপদ। রাশিয়া ভারতের সঙ্গে চুক্তি করেছে মানে এই নয় যে, সে পাকিস্তানকে খরচার খাতায় লিখে দিয়েছে। রাশিয়া এখনও পাকিস্তানের সঙ্গে সদ্‌ভাব রাখতে চায়। তাই পদগরনি ইরানে ইয়াহিয়াকে আশ্বাস দিয়েছেন যে, রাশিয়া পাকিস্তানের স্বাধীনতা এবং রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা বজায় রাখার ব্যাপারে আগ্রহী। সে জন্য সে সর্বতোভাবে পাকিস্তানকে সাহায্য করবে। এখন ভারত-পাক যুদ্ধ হলে তা থেকে রাশিয়ার কোনও লাভ হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

ব্রিটেনেরও সেই অবস্থা। ব্রিটিশ সরকার পাকিস্তান, ভারত এবং বাংলাদেশের জনমত কাউকেই তেমন চটাতে চায় না। পাকিস্তানে ব্রিটেনের যে ব্যবসা-বাণিজ্য ও কলকারখানা রয়েছে তার শতকরা ষাটভাগের বেশিই পূর্ববাংলায়। পূর্ববাংলায় যতক্ষণ না স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসছে ততক্ষণ ব্রিটেনের যথেষ্ট আর্থিক ক্ষতি। ব্রিটেন জানে, বাংলাদেশ পূর্ণ স্বাধীনতা পেয়ে গেলে পূর্ব-বাংলায় তাদের অর্থনৈতিক প্রভাব কমে যাবে। আবার যদি এই লড়াই পূর্ববাংলায় চলতে থাকে তাহলেও তার বিরাট ক্ষতি। ব্যবসা-বাণিজ্য ও কলকারখানা সব ধ্বংস হয়ে যাবে।

এসব সত্ত্বেও কিন্তু সবাই জানেন যে এই সংকটে মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের সহানুভূতি প্রধানত পাকিস্তানী সামরিক কর্তৃপক্ষেরই দিকে। তাঁরা অস্ত্রশস্ত্র দিয়েও পাক কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করছেন। আর এটাও সবাই জানেন যে, রাশিয়ার সহানুভূতি ভারত ও বাংলা-দেশের প্রতি। রাশিয়া প্রকাশ্যে সে কথা বলতে অবশ্য রাজি নয়। কারণ, পাকিস্তানকে সে এখনও হাতে রাখতে চায়। কিন্তু এটা পাক কর্তৃপক্ষও জানে যে, মুক্তিসেনারা যে সব অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করছেন তার অনেকগুলিই রাশিয়ায় তৈরি। ডিনামাইটগুলি যে চেকোশ্লাভাকিয়ায় তৈরী তাও পাক কর্তৃপক্ষ জানে। এবং তারা এও নিশ্চয়ই বোঝে যে, রাশিয়া বিরোধীতা করলে মুক্তিসেনারা চেক অস্ত্রশস্ত্র পেতে পারে না।

কার আসল সহানুভূতি কোন্ দিকে সেটা অবশ্য আজকের এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নয়। আজকের প্রধান আলোচ্য বিষয়, রাজনৈতিক সমাধানের প্রস্তাব এবং তার সাফল্যের সম্ভাবনা।

সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, তিনটি রাষ্ট্র যে "রাজনৈতিক সমাধানের" প্রস্তাব দিচ্ছেন তার সাফল্যের কোনও সম্ভাবনা আছে কি না?

আপাত দৃষ্টিতে দেখতে গেলে অবশ্য তার কোনওই সম্ভাবনা

নেই। কারণ, ইয়াহিয়া যেমন একদিকে বলে দিয়েছেন যে, তিনি "বিদ্রোহীদের" সঙ্গে কোনও রফার আলোচনা করতে রাজি নন, অন্য দিকে তেমনি বাংলাদেশ নেতারাও ঘোষণা করেছেন যে, বাংলাদেশের পূর্ণ স্বাধীনতা ছাড়া আর কিছু তাঁরা মানতে রাজি নন। এই অবস্থায় রফাটা হবে কোথায়?

দুদিন আগেই এই রফার সম্ভাবনার কথা নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল একজন ব্রিটিশ কূটনীতিবিদের সঙ্গে। ভদ্রলোক ইসলামাবাদ হয়ে কলকাতা এসেছিলেন। জিজ্ঞেস করলেন: কী মনে হয়, আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব পাক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কোনও রফায় রাজী হতে পারে?

আমি তাঁকে পাল্টা জিজ্ঞেস করলাম: আপনার কি মনে হয় পাক কর্তৃপক্ষ মার্চ মাসে বাংলাদেশের নেতাদের সঙ্গে যে ব্যবহার করেছে, গত কয়েক মাসে বাংলাদেশের মানুষের উপর যে অকথ্য ও অমানুষিক অত্যাচার চালিয়েছে, যেভাবে লক্ষ লক্ষ বাঙালীকে খুন করেছে, প্রায় এক কোটি মানুষকে দেশছাড়া করেছে তারপর কোনও বাংলাদেশ নেতার পক্ষে সেই পাকিস্তানীদের সঙ্গে রফা করা সম্ভব? আপনি বাঙালী হলে করতে পারতেন?

ভদ্রলোক বললেন: ধরুন যদি ইয়াহিয়া শেখকে মুক্তি দিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা শুরু করেন?

আমি জানতে চাইলাম: ইয়াহিয়া শেখকে মুক্তি দেবে এটাই কি আপনাদের খবর?

ভদ্রলোক জবাবটা এড়িয়ে তাজুদ্দিন প্রসঙ্গে চলে গেলেন।

দুইযুদ্ধ, একযুদ্ধ, সীমাবদ্ধ না সার্বিকযুদ্ধ ?

পান্নালাল দাশগুপ্ত

যুদ্ধ কি লাগবে, এই প্রশ্নটাই আজ সকলের। এ প্রশ্নের উত্তর কেউ জানে না। ভারত সরকার বলেন, "আমরা জানি না।" কেননা ভারত কখনও গায়ে পড়ে যুদ্ধে নামবে না। ভারত সরকার বলেন, যুদ্ধ হবে কি হবে না, জানে পাকিস্তান। পাকিস্তানই যুদ্ধ লাগাতে পারে, আচমকা অতর্কিত আক্রমণ করেও বসতে পারে। অতএব ভারত নিশ্চিন্ত থাকতে পারে না, ভারতকে সার্বিক প্রস্তুতি করতে হবে সর্বপ্রকার অবস্থা ও ঘটনার জন্য। ভারত সরকার বলেন, তারা প্রস্তুত, প্রস্তুত প্রত্যুত্তর দেবার জন্য—কিন্তু যুদ্ধ তারা বাধাবেন না; বাধায় যদি, বাধাবে পাকিস্তান।

এই একটি বিষয়ে ভারত সরকারের ভাষাকে বিশ্বাস করা উচিত। বাংলাদেশ সমস্যার গোড়া থেকেই ভারত যুদ্ধে যাতে নামতে না হয় তার জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা করে চলেছে। যখন দুই দিকেই এখন সৈন্য সমাবেশ হয়েছে, এবং 'আকাশে বারুদের গন্ধ' পাচ্ছে সবাই, তখনও ভারতের প্রধানমন্ত্রী পশ্চিমা দুনিয়ার নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে বিশদিনের জন্য বাইরে চলে গেলেন। যদি অবিলম্বে যুদ্ধ করা বা বাংলাদেশের ব্যাপারে কোন গুরুত্বপূর্ণ হস্তক্ষেপ করার প্রোগ্রাম থাকতো, তবে প্রধানমন্ত্রী এত সমস্যা ও সঙ্কটসঙ্কুল ভয়াবহ অবস্থাতে, ভারতকে ফেলে বিদেশে এতদিনের জন্য যেতে পারতেন না।

স্রেফ নিমন্ত্রণ রক্ষা করার সময় এটা নয়। আসলে বিদেশে রাষ্ট্রনেতাদের বাংলাদেশ নিয়ে ভারতের সমস্যা শেষবারের মত বোঝাবার জন্যই হয়তো তাঁর এই যাত্রা। যে উদ্দেশ্যে ভারতের

পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্বর্ণ সিং সহ প্রায় সব মন্ত্রীই বিদেশে ঘুরেছেন এবং অন্যান্য অনেক রাজনৈতিক নেতারা গিয়েছিলেন, সেই উদ্দেশ্যেই প্রধানমন্ত্রী ও যাচ্ছেন, অর্থাৎ যুদ্ধবিগ্রহ না করে বাংলাদেশ সমস্যা ও শরণার্থী সমস্যা কী করে দূর করা যায়। ভারতের রাষ্ট্রদূতেরা, প্রতিনিধিরা, মন্ত্রীরা সবাই যা করতে পারেননি, প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং নিজে গিয়ে দেখছেন বিদেশী রাষ্ট্রনায়কদের বোঝাতে পারেন কিনা। সোভিয়েত রাশিয়াতে আগেই গিয়েছেন, ইন্দো-সোভিয়েত বন্ধুত্ব চুক্তি করেছেন, কিন্তু বাংলাদেশ সম্বন্ধে ভারতের নীতিকে সোভিয়েত-গ্রাহ্য করতে পারেননি। বাংলাদেশ সম্বন্ধে সোভিয়েত ও ভারতে মতৈক্য হয়নি—যদিও পরোক্ষে ভারতের উপর পাকিস্তান বা অন্য কারো সম্ভাব্য আক্রমণ—যে কোন কারণেই হোক—এই চুক্তির দ্বারা কিছুটা প্রতিহত হয়েছে। উদ্দেশ্য একই যাতে ভারত যুদ্ধ করতে না চাইলেও, অন্যরা যেন গায়ে পড়ে ভারতকে আক্রমণ না করতে আসে। এক্ষেত্রেও ভারতের যুদ্ধ না করার নীতিই প্রতিফলিত হচ্ছে। পাছে বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকাব করলেও পাকিস্তান যুদ্ধ বাধিয়ে বসে, এই চিন্তা থেকেও এই স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি।

এত সব ব্যাপারের পরও যখন আমেরিকা, রাশিয়া, ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ ভারতকে সংযত থাকার জন্য এবং সীমান্ত থেকে সৈন্য সরিয়ে নেবার জন্য চাপ দিচ্ছে, তখন তার অর্থ কি? দুই দেশের সৈন্যবাহিনী মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকলে, দুই দেশের অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভুল বুঝেও হঠাৎ একটা যুদ্ধ লেগে যেতে পারে—এই হবে এদের যুক্তি। কে আগে সৈন্যবাহিনীকে ব্যূহ রচনা করে সীমান্তে দাঁড় করিয়েছে, কে বাংলাদেশ বলে একটা সমস্যা সৃষ্টি করেছে, এসব বাছবিচার 'শান্তিকামী' মুরুব্বীদের নেই। ভারত ও পাকিস্তানকে তারা একই চক্ষে দেখে, সমদোষী মনে করে। কিন্তু আসল ব্যাপারটা যে কী, সে কথা এই মুরুব্বিরা জানেন না তা নয়।

আসল ব্যাপারটি হলো, বাংলাদেশে একটা যুদ্ধ চলেছে। সে' যুদ্ধ লাগবে না, অনেকদিন ধরেই লেগে গেছে। ভারতের কাছ থেকে পরোক্ষে যে সাহায্য পায় মুক্তিযোদ্ধারা সে সাহায্যটা কী ভাবে বন্ধ করা যায় এই হলো মুরুব্বিদের উদ্দেশ্য। মুক্তিযোদ্ধারা সীমান্ত বরাবর একটা নিরাপদ পশ্চাৎভূমি বা আশ্রয় পাচ্ছেন, দরকার মত এগোতে পেছুতে পারছেন, হয়তো সীমান্ত দিয়ে কিছু সংগ্রামের রসদ পাচ্ছেন—যত সামান্যই হোক, বাংলাদেশের কতক কতক অঞ্চলে আধিপত্য রক্ষা করে সংগ্রামের ক্ষেত্র রচনা করতে পারছেন—এবং এর ফলে মুক্তিবাহিনী ক্রমশ একটা স্থায়ী ও বর্ধমান শক্তি হয়ে উঠতে পারে,—এ সুবিধা যাতে মুক্তিবাহিনী না পায় তারই জন্য ভারতকে সীমান্ত বরাবর সৈন্যবাহিনী দাঁড় করাতে মুরুব্বিদের আপত্তি। পাকিস্তানেরও এই আর্জি বিশ্ব মুরুব্বিদের কাছে। অর্থাৎ মুক্তিবাহিনীকে উপোস করিয়ে, চারদিক থেকে বন্ধ করে, গলা টিপে মারাই হলো এই আপত্তির মূল উদ্দেশ্য।

অতএব বলা যায়, যুদ্ধ দুটি। একটি যুদ্ধ বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তান, যে যুদ্ধ লেগেই আছে, লাগবে নয় এবং উত্তরোত্তর তার তাপ ও চাপ বৃদ্ধি পেতেই থাকবে। আর একটি যুদ্ধ হলো পাকিস্তান বনাম ভারত—যে যুদ্ধটা লাগেনি, তবে লাগতে পারে। তবে প্রথম যুদ্ধটি দ্বিতীয় যুদ্ধকে ডেকে আনতে পারে। যদি মুক্তিবাহিনীর মুক্তি-সংগ্রাম আরও বেশী দানা বেঁধে ওঠে এবং ক্রমশ দুর্বার হতে থাকে তবে পাকিস্তান গায়ে পড়েই ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বাধিয়ে রাষ্ট্রপুঞ্জের হস্তক্ষেপেব আড়ালে নিজেদের বাঁচবার চেষ্টা করবে। এ অবস্থাটা কার্যকারণ সূত্রে আসবেই—যদি না কোন দৈব কিছু ঘটে যায়, অর্থাৎ খাস পাকিস্তানে অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তানেই কোন রাষ্ট্রীয় ওলটপালট ঘটে যায়। আর ভারত যদি কোন অবস্থাতেই যুদ্ধ করতে যাবে না মনে করে, তবে বাংলাদেশ বাঁচুক কি মরুক, মুক্তিযোদ্ধারা মুছে যাক বা না যাক—কোন প্রকার দায়িত্বই ভারত স্বীকার করবে'

না। কিন্তু এতটা চোখ উল্টে দেওয়া ভারতের নিজের স্বার্থেই অসম্ভব। ভারতের সমস্যা কেবল এক কোটি শরণার্থী—আর কিছু নয়—এ হেন যুক্তি হাস্যকর। যত কোটি টাকাই লাগুক এক কোটি শরণার্থীকে কয়েক বছর পুষতে, তাও যদি বিশ্ব-মুরুব্বিরা সবটা দিতে রাজী না হয় তবে কি ভারত চোখ উল্টে বসে থাকতে পারে? এক কোটি লোক কেন, প্রতি বছর ভারতে দুই কোটি করে নতুন লোক বাড়ে—তাদেরকেও তো ভারতকে পুষতে হয়, হবে। এক কোটি লোকের খরচ বা অর্থনীতিটা আসল প্রশ্ন নয়, প্রশ্নটি রাজনৈতিক। বাংলাদেশ বলে যে একটি ঘটনা বা 'ফেনোমেনা'র উদ্ভব হয়েছে সেটি আকস্মিক নয়, অস্বাভাবিক নয়, অনৈতিহাসিক নয়, এটি ভারতবর্ষ বা পাকভারত উপমহাদেশের একটি অভ্যন্তরীণ সমস্যা, যা দুটি দেশে ভাগ করেও সংশোধন করা যায়নি—১৯৪৭ সালে। এটা পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার কি ভারতের ব্যাপার—এভাবে নির্দিষ্ট করা চলবে না। এটি এমন একটি ব্যাপার যা পাকিস্তানের, পাক-ভারত উপমহাদেশের এবং শেষ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক ও সর্বমানবিক। এর সমাধানের মধ্যেই জড়িয়ে আছে সাম্রাজ্যবাদের শেষ শিকড়, জাতি-পাতিজাত সাম্প্রদায়িকতা, গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক প্রগতির পথে যাবতীয় অন্তরায়ের মূলোচ্ছেদের চূড়ান্ত সমাধান। এ ক্ষেত্রে ইতিহাসের দিক থেকে কোন আপস নেই—আপসের স্থান নেই।

এই জন্যই প্রথম যুদ্ধটি দ্বিতীয় যুদ্ধে 'এসকালেট' যা প্রসারিত হতে চায়। এবং তাতে টান পড়ে সকল বৃহৎ শক্তি-জোটের স্বার্থে—মুরুব্বিদের মৌরসী পাট্টার। দুটি যুদ্ধ শেষ পর্যন্ত একটি যুদ্ধেই প্রসারিত হতে চায়। যাতে দ্বিতীয় যুদ্ধটি লেগে গিয়ে একটা চূড়ান্ত সমাধান না হয়ে যায়—তার দিকে তীব্র দৃষ্টি মুরুব্বিদের, কেননা তাতে এই উপমহাদেশে মাতব্বরি করার আর কোন ক্ষেত্র থাকবে না কারও।

কিন্তু বর্তমানে যুদ্ধের বাস্তব অবস্থাটা সত্যি কি? যে দুই যুদ্ধের কথা বলা হলো, তা কি এখুনি একই যুদ্ধের আকার নিচ্ছে না? ভারতের পূর্ব সীমান্ত বরাবর যে গুলি-গোলা ও হামলা প্রতিহামলা চলেছে, তা বাস্তবে পাকিস্তান ও ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে গোলাগুলি বিনিময়ে পর্যবসিত হচ্ছে। পাকিস্তানীরা দূর পাল্লার কামান ব্যবহার করছে, যার গোলাগুলি খাস ভারতের অভ্যান্তরে এসে পড়ছে, এমন কি আগরতলার মত ত্রিপুরার রাজধানীর মধ্যেও এসে পড়ছে। পাকিস্তানীরা বলবে, কী করবো, বাংলাদেশ-মুক্তিবাহিনীকে তাড়া করতেই তো হবে তাদের. তাদের বেসগুলি ভারতের সীমান্তে, দরকার মত তারা ভারতে আশ্রয় নেয়, এবং ভারতীয় সৈন্যবাহিনী তাদের কামান ও মর্টারের কভার বা আচ্ছাদন দেয়। ভারত বলবে, বাংলাদেশ বনাম পাকিস্তানের যুদ্ধের ঝামেলা আমরা কত পোহাবো, এ ঝামেলা বা এ যুদ্ধ যাতে আমাদের গা ঘেঁষে পাকিস্তানীরা না করতে পারে তাব জন্য সীমান্ত রক্ষার ও স্বদেশ রক্ষার প্রয়োজনে পাল্টা গোলাগুলি করতেই হবে। তাছাড়া ইতিমধ্যেই গুপ্তচর বাহিনীর সাহায্যে কাছাড়ে ও অন্যত্র পাকিস্তান ভারতের মধ্যেই অন্তর্ঘাত ও অরাজকতা সৃষ্টি করে এক ধরনের গোপন যুদ্ধ লাগিয়ে দেয়নি কি? এই কার্যকলাপ তাদের আরও বেপরোয়াভাবে চলবে বলেই ধরে নেওয়া উচিত। এইভাবে সীমান্ত বরাবর একটা যুদ্ধ, বা দ্বিতীয় যুদ্ধটাও লেগে গেছে। ভারতীয় নাগরিকেরাও সীমান্ত অঞ্চল ত্যাগ করে ভিতরে আসতে শুরু করেছে, আর পাকিস্তান তো এ যুদ্ধ করবো বলেই পূর্ব নির্ধারিত পলিসি অনুযায়ী তাদের সীমান্ত বরাবর গ্রামগুলিকে জনশূন্য করে দিচ্ছে।

কিন্তু এই যুদ্ধ সহসা একটা সার্বিক 'শুটিং ওয়ার' বা অল-আউট ওয়ারে পরিণত না-ও হতে পারে। যাকে বলে অঘোষিত 'লিমিটেড ওয়ার' বা 'সীমাবদ্ধ যুদ্ধ' তাই কিছুকাল ধরে চলতে পারে—দুই দেশের মধ্যে—অর্থাৎ পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে। যেমন

ভিয়েতনামের যুদ্ধ একটা খুব বড় যুদ্ধ, এমন কি তৃতীয় মহাযুদ্ধও বলা চলে, যেখানে বিশ্বের প্রায় সকল বৃহৎ রাষ্ট্র প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশ নিয়েছে, কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রটা বিস্তৃত হতে দেয়নি, একটা সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রেই সেই শক্তিপরীক্ষা চলছে দীর্ঘদিন ধরে। তাই বলে গুলিগোলা ও অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার ও লোকক্ষয়ের দিক থেকে তা সীমাবদ্ধ নয়, এত বোমা পড়েছে সেখানে যা গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেও ব্যবহৃত হয়নি। তেমনি যদি ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে 'বাংলাদেশ' সমস্যা নিয়ে দীর্ঘদিন একটা সীমান্ত বরাবর সীমাবদ্ধ যুদ্ধ চলতে থাকে তার ক্ষয়-ক্ষতি ও ব্যয়বহরও সামান্য বা সীমাবদ্ধ থাকবে না—সর্বশক্তি দিয়েই এই সীমাবদ্ধ যুদ্ধে উভয় দেশ তাদের শক্তিপরীক্ষা করতেই থাকবে। এই পরিস্থিতিকে বুঝে স্বীকার করে নিয়ে দৃঢ় চিত্তে অগ্রসর হওয়াই সমীচীন নইলে এটাকে একটা 'টোআই-লাইট' যুদ্ধ মনে করে চললে বেয়াকুব বনে যেতে হবে, এবং অযথা অন্তহীন দুঃখ ভোগ করতে হবে জনসাধারণকে দীর্ঘকাল ধরে।

পাকিস্তানের সঙ্গে এই যুদ্ধ ভারত সরকার চান না। না চাইলেও যদি যুদ্ধ করতে হয়, তবে ভারতের স্বার্থ নিশ্চয়ই একটি সীমাবদ্ধ যুদ্ধে, সার্বিক যুদ্ধে নয়। কেননা, ভারত পূর্ব ও পশ্চিম উভয় সীমান্তেই যুদ্ধ করতে চাইবে কেন? ভারত পূর্ব পাকিস্তানকে অনায়াসেই দীর্ঘদিন ঘিরে রেখে বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীকে তাদের স্বাধীনতা-যুদ্ধ চালিয়ে যেতে সাহায্য করতে পারে, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে যোগসূত্র ও সরবরাহসূত্র অনায়াসে ছিন্ন করে দিতে পারে এবং এ ক্ষেত্রে পাকিস্তানের পক্ষে বাংলাদেশে পরাজিত হয়ে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। তারা প্রতিশোধ নিতে চাইবে পশ্চিমাঞ্চলে। তারা অবিলম্বে দ্বিতীয় ফ্রন্ট খোলার পক্ষপাতী, কিন্তু ভারত কেন গায়ে পড়ে দ্বিতীয় ফ্রন্ট খুলতে যাবে? অবশ্য যদি পূর্বেই ভারত পশ্চিম ও কাশ্মীর সীমান্ত বরাবর সৈন্য সামন্ত মোতায়েন করতো, তবে পূর্ব পাকিস্তানে অত সৈন্যসামন্ত ও সাজ-সরঞ্জাম পাঠাতে পাকিস্তান

সাহস পেতো না, মুক্তিবাহিনীর পক্ষে সংগ্রামটা সহজ হতো, কিন্তু ভারত তা না করে ভুলই করেছিল হয়তো। তবে ইতিমধ্যে পাকিস্তান যত সৈন্যসামন্ত আর যন্ত্রপাতিই পূর্ব পাকিস্তানে এনে থাকুক না কেন, সেগুলি শেষ পর্যন্ত আটকা পড়েই যাবে—যদি সত্যি সত্যি ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধটা সক্রিয় ও মুক্ত আকার নেয়। আটক অবস্থায় বা-এনসারকেল্ড হয়ে দীর্ঘদিন যুদ্ধ করার মত স্বয়ংসম্পূর্ণতা পূর্ব বাংলায় বা বাংলাদেশে আজ পাকিস্তানের কিছুতেই হতে পারে না, যদি না চীন বা অন্য কোন রাষ্ট্রকে দিয়ে ভারতের বিরুদ্ধে কোন দ্বিতীয় ফ্রন্ট খোলাতে পারে।

অবস্থাটা তাই পাকিস্তানের পক্ষে বেপরোয়া, অসহনীয় এবং যত দিন যাবে তত তার অবস্থায় অসহায়তা তাকে শ্বাসরুদ্ধ করে ছাড়বে। কাজে কাজেই পাকিস্তান সীমাবদ্ধ যুদ্ধের মধ্যে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না—তার পক্ষে এস্‌পার কি ওস্‌পার করে ঝাঁপিয়ে পড়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া স্বাভাবিক—উভয় ফ্রনটেই যুগপৎ যুদ্ধ লাগিয়ে রাষ্ট্রপুঞ্জের হস্তক্ষেপ ডেকে এনে একটা জগাখিচুড়ি অবস্থা সৃষ্টি করার প্রেরণা তার থাকা স্বাভাবিক, এবং এই জন্যই তাকে অনবরত আক্রমণকারী উস্কানি দিতেই হবে।

এত সত্ত্বেও, এত প্ররোচনা সত্ত্বেও ভারত সীমাবদ্ধ যুদ্ধের স্বার্থের কথা ভুলতে পারে না। আবার সর্বশক্তি নিয়ে সহসা ভারতের উপর সবদিক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ার পক্ষে এখনও পাকিস্তানের হয়তো নানা ভাবনাচিন্তাও থাকতে পারে—বিশেষ করে রাষ্ট্রপুঞ্জ, রাশিয়া, চীন, আমেরিকা প্রভৃতি বৃহৎ শক্তিগুলির সম্ভাব্য ব্যবহার সম্বন্ধে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত। সে অবস্থায় এখন যে ধরনের সীমাবদ্ধ একটা যুদ্ধ লেগে গেছে, যার প্রধান অংশীদার বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী, পাকিস্তান ও ভারত, সীমান্তের লড়াই, গেরিলা লড়াই, ভারতের অভ্যন্তরে অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপ এগুলিই ছোট বড় নানা আকারে অনবরত ফুটতে ফাটতে থাকবে। এর ঝামেলা কম নয়। এর

আঘাত প্রত্যাঘাত এর ক্ষয়ক্ষতি ভারতীয়দের ভুগতে হবে, কিন্তু জনসাধারণকে সব ব্যাপারটা ভাল করে বুঝিয়ে না দিতে পারলে এবং এই সীমাবদ্ধ বা আংশিক যুদ্ধের সময়ে তাদের কার্যকলাপ ও ব্যবহার কী ধরনের হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে তাদের ওয়াকিবহাল না করে দিলে, তারা অযথা মরবে, প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হবে। আর যারা বর্তমানে ক্ষমতায় আছেন, রাজ্য চালাচ্ছেন, যুদ্ধের প্রস্তুতি ও পরিচালনা করছেন, তাঁদেরও এই যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি, সীমাহীনতা সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা থাকা চাই। আমরা যেন কোন কনফিউশানে বা বিভ্রান্তিতে না ভুগি।

ইয়াহিয়া আর এক ধাপ এগিয়ে যেতে পারেন

শংকর ঘোষ

জলে স্থলে, অন্তরীক্ষে নাস্তা-নাবুদ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করলেন। বুনিয়াদী গণতন্ত্র, বেসামরিক সরকারের তকমধারী জঙ্গী শাসন ইত্যাদি অনেক রকম ভাঁওতার আড়ালে যে-দেশ প্রায় পনেরো বছর একের পর এক সমর-নায়কের পদানত, সে-দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা অর্থহীন। সামরিক শাসনই জরুরী অবস্থার নির্দেশক ; পাকিস্তানে জরুরী অবস্থা চিরন্তন। বাংলাদেশে ঠিক আট মাস ধরে যে-তাণ্ডব চলেছে তাও এই জরুরী অবস্থাকালীন সামরিক আইনসিদ্ধ। এমন কোন ক্ষমতা অবশিষ্ট নেই যা জরুরী অবস্থা ঘোষণার ফলে ইয়াহিয়া খানের করায়ত্ত হবে।

তা সত্ত্বেও তিনি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেছেন কেবল এই অপপ্রচারের জন্য যে ভারত পাকিস্তানকে আক্রমণ করতে উদ্যত। ইতিপূর্বেই তিনি গেয়ে রেখেছেন সীমান্তে অঘোষিত যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। এর পরের পর্ব ঘোষিত-যুদ্ধ। ভারতকে আক্রমণোদ্যত ঘোষণা করে ইয়াহিয়া খান ভারত আক্রমণের অছিলা সৃষ্টি করেছেন। প্রায় এক কোটি নিঃস্ব লোককে এদেশে পাঠিয়ে ও হাজার খানেক সীমান্ত সংঘর্ষের সৃষ্টি করে আট মাস তিনি ভারতের উপর যে-প্রচ্ছন্ন আক্রমণ চালিয়েছেন এবার তা প্রত্যক্ষ আক্রমণে উত্তীর্ণ হবে।

প্রধানমন্ত্রী সংসদে যে-বিবৃতি দিয়েছেন তাতেই স্পষ্ট, ভারতের পাকিস্তানকে আক্রমণের কোন অভিপ্রায় নেই। শ্রীমতী গান্ধী এদেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করতে সম্মত নন এবং পাকিস্তান যদি আক্রমণাত্মক কাজকর্ম চালিয়ে না যায় তাহলে জরুরী অবস্থা ঘোষিত

হবে না। এমন কি, বয়রা সীমান্তে আকাশ যুদ্ধকেও প্রধানমন্ত্রী স্থানীয় সংঘর্ষ বলে অভিহিত করেছেন।

এসব সত্ত্বেও ইয়াহিয়া খান মিথ্যার বেসাত ফিরি করছেন এই আশায় যে, দু' একজন আন্তর্জাতিক ক্রেতা জুটে যেতে পারে। তাঁরা কেউ যদি নিরাপত্তা পরিষদে বা রাষ্ট্রপুঞ্জে বিষয়টি তোলেন তাহলে তথাকথিত শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলি এই উপমহাদেশে শান্তি রক্ষায় তৎপর হতে পারেন। বাংলাদেশ সম্পর্কে তাঁদের আট মাসের নিরেট ঔদাসীন্য কুম্ভকর্ণের নিদ্রাকেও ছাড়িয়ে গেছে। কাজেই পাকিস্তানের আশা, এখন যদি তাঁদের নিদ্রাভঙ্গ হয় তাহলে সমস্যার সমাধানের জন্য তাঁরা মার্চ মাসেব পুরনো ইতিহাস ঘাঁটতে যাবেন না, তাঁদের তদন্ত শুরু হবে ইয়াহিয়া খান যেদিন অভিযোগ দায়ের করলেন সেদিন থেকে। তাতে বাংলাদেশ সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান, শেখ মুজিবর রহমানের মুক্তি, গণহত্যা—সব প্রশ্নই আপাতত হিমঘরে চলে যাবে। যেসব দেশ রাজনৈতিক সমাধানেব জন্য ইয়াহিয়া খানকে চাপ দিচ্ছিলেন তাঁরা যুদ্ধ বন্ধের জন্য ব্যস্ত থাকবেন, ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে আন্তর্জাতিক অভিভাবকত্বে স্থিতাবস্থা কায়েমেব ব্যবস্থা হবে, এবং তার ফলে ইয়াহিয়া খান নিজের দুষ্কৃতির জন্য যে সঙ্কটে পড়েছেন তার মোচন হবে।

প্রথম দফায় কিন্তু ইয়াহিয়া খানের হার হয়েছে। পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে আক্রমণের অভিযোগ এতবার এনেছে যে পাকিস্তানের চির-পুরাতন মিত্ররাও আর তা সহজে বিশ্বাস করতে পারছেন না। আন্তর্জাতিক বাজারে এখন পাকিস্তানের উপর আস্থায় মন্দা। তাই যখন পাকিস্তানি মুখপাত্র রাষ্ট্রপুঞ্জে ভারতের বিরুদ্ধে অভিযোগ দাখিল করছেন ঠিক সেই সময়েই রাষ্ট্রপুঞ্জের মুখপাত্র ঘোষণা করছেন, নিরাপত্তা পরিষদে বিষয়টি তোলবার কোন ইচ্ছা আপাতত সাধারণ সচিব উ থাণ্ট-এর নেই। বর্তমান অবস্থা বজায় থাকলে রাষ্ট্রপুঞ্জের হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা নেই বলেই মনে হয়।

তবে যুদ্ধ হবে কিনা তা ভারতের উপর নির্ভর করে না। পাকিস্তানে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করার পরও যদি আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপ না হয়, তাহলে ইয়াহিয়া খান আর এক ধাপ এগিয়ে যেতে পারেন, ভারত আক্রমণ করে তিনিই নিজেকে আক্রান্ত বলে চিৎকার করতে পারেন। সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রপুঞ্জ বা নিরাপত্তা পরিষদ চুপ করে থাকবেন মনে হয় না।

আমেরিকা সরকার ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছেন ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ বাধলে দুই দেশই মার্কিন সাহায্য থেকে বঞ্চিত হবে। ১৯৬৫ সালে আয়ুবের পাকিস্তান যখন ভারত আক্রমণ করে তখনও তাঁরা এই নীতি অনুসরণ করেছিলেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে, যুদ্ধমান দুটি দেশই তখন আমেরিকার চোখে এক হবে। এই সমীকরণে ভারতের আপত্তির কথা শ্রীমতী গান্ধী বারবার ঘোষণা করেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি সমীকরণও হবে না। কারণ ভারতের মোট বৈদেশিক সাহায্যের প্রায় অর্ধেক আমেরিকার। সেই তুলনায় পাকিস্তানকে সাহায্যের পরিমাণ কম এবং সে সাহায্যও বাংলাদেশে বর্বরতার পর বন্ধ আছে।

বৃটেন বা ফ্রান্স যে কোন ভিন্ন নীতি নেবে তা মনে হয় না। বৃটেন ও আমেরিকা ভারত-পাকিস্তান বিরোধে সর্বদাই এক নীতি অনুসরণ করেছে এবারও তার ব্যতিক্রম হবে না। ফ্রান্সে এখন আর দ্য গল নেই যে, অন্য কোন কারণে না হোক, স্বমত পোষণের স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য ফ্রান্স ভিন্ন কোন নীতি নেবে। এক ফরাসী সাংবাদিক সম্প্রতি বলছিলেন, শ্রীমতী গান্ধীর সফরের আগে তাঁর দেশের খবর-কাগজগুলি পর্যন্ত বাংলাদেশ সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানত না; সাধারণ লোক তো পরের কথা। যে দেশ আট মাস ধরে বাংলাদেশ সমস্যাকে কোন গুরুত্ব দেয়নি সে দেশ হঠাৎ এই উপমহাদেশের মূল সমস্যাটি বুঝতে পারবে মনে হয় না। মালরো একক।

এমন কি সার্ত পর্যন্ত এতদিনেও বাংলাদেশের বিষয়ে একটি কথা বলারও সময় পাননি।

ভারত-সোভিয়েট চুক্তির পর সোভিয়েট ইউনিয়নের কথা স্বতন্ত্র। অবিরত পারস্পরিক আলোচনার ফলে সোভিয়েট সরকার জানেন ভারতের ভূমিকা কী। সুতরাং পাকিস্তানের মিথ্যা প্রচারের শিকার তাঁরা হবেন না। প্রাভদায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে বর্তমান অবস্থার জন্য পাকিস্তানকে দায়ী করা হয়েছে। বয়রায় আকাশ-যুদ্ধ ও সীমান্তে উত্তেজনা প্রশমনের জন্য শ্রীমতী গান্ধীর আবেদন—দুটিই প্রকাশিত হয়েছে। অর্থাৎ সোভিয়েট ইউনিয়নের সর্বশেষ বিচারে পাকিস্তানই বর্তমান অবস্থার জন্য দায়ী। যদি যুদ্ধ রোধ সম্ভব না হয় তাহলেও সোভিয়েট ইউনিয়নের এই সিদ্ধান্ত পরিবর্তনেব কোন লক্ষণ নেই।

নিরাপত্তা পরিষদের নবতম স্থায়ী সদস্য চীন কী নীতি গ্রহণ করবে তা এখনও স্পষ্ট নয়। রাষ্ট্রপুঞ্জের তৃতীয় কমিটিতে চীনা প্রতিনিধি যা বলেছেন তাতে মনে হওয়া স্বাভাবিক, পাকিস্তানের অভিযোগ চীনা সমর্থন পাবে। যতদিন ভারত-চীন সীমান্ত সমস্যার সমাধান না হয় ততদিন চীনের অন্য কোন নীতি অবলম্বন সম্ভব নয়। ততদিন চীন ভারতকে আক্রমণকারী বলে যাবে যাতে ভারতের বিরুদ্ধে চীনের নিজের অভিযোগ দৃঢ়তর হয়। চীন পাকিস্তানকে সমর্থন করবে ইয়াহিয়া খানের স্বার্থে নয়, নিজের স্বার্থে।

রাষ্ট্রপুঞ্জে আমেরিকা, সোভিয়েট ইউনিয়ন ও চীন এই তিন বৃহৎ শক্তির সমাবেশ ভারত-পাকিস্তান বিষয়ে কী হবে তা বলা শক্ত। আমেরিকা সরকার সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে এই প্রসঙ্গে আলোচনায় উদ্যত হয়েছেন। তাসখন্দ আলোচনা ও চুক্তিতেও আমেরিকার সম্মতি ছিল। দুই দেশের নীতিতে যথেষ্ট প্রভেদ থাকলেও যুদ্ধ রোধের উপায় সম্পর্কে আমেরিকা ও সোভিয়েট ইউনিয়নের ঐকমত অসম্ভব নয়। এমন কি ভারতের বিরুদ্ধে

বিষোদগার সত্ত্বেও চীন সে-উপায়ের প্রত্যক্ষ বিরোধিতা না করতে পারে।

তবে ইয়াহিয়া খান যদি যুদ্ধ ছাড়া ক্ষান্ত না হন তাহলে রাষ্ট্র-পুঞ্জকে যুদ্ধবিরতির জন্য উদ্যোগী হতেই হবে। এবং রাষ্ট্রপুঞ্জ তখন যে-ব্যবস্থা নেবেন তাতে ভারত পাকিস্তানের সমীকরণ অনিবার্য। সে-অবস্থায় মূল সমস্যাটি যাতে উপেক্ষিত না হয় তার জন্য ভারত সরকারকে সচেষ্ট থাকতে হবে। জাতীয় স্বার্থে রাষ্ট্রপুঞ্জের সুপারিশ অগ্রাহ্য করার অনেক নজির পঁচিশ বছরে জমা হয়েছে।

যুদ্ধ অথচ যুদ্ধ নয় ।। আসলে কী ঘটছে

আবদুল গাফফার চৌধুরী

সারা ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে একটা বড় রকমের যুদ্ধ লাগ্ লাগ্ ভেবে যাঁরা উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন তাঁরা একটু ঠাণ্ডা মাথায় ঘটনা পরম্পরা বিশ্লেষণ করলেই বুঝতে পারবেন, যদি অভাবনীয় ও অকল্পনীয় কিছু না ঘটে, তাহলে আগামী এক সপ্তাহ—এমনকি এক পক্ষকালের মধ্যেও এই সীমাবদ্ধ সংঘর্ষের বিস্তৃতি ঘটার কোন কারণ নেই এবং কারণ নেই জেনেই শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী পার্লামেন্টে দৃঢ় আস্থার সঙ্গে ভারতে এই মুহূর্তে জরুরী অবস্থা ঘোষণার সম্ভাবনা অস্বীকার করতে পেরেছেন। একথা সত্য, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে মুক্তিবাহিনীর আক্রমণের তীব্রতা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং যুদ্ধে তাদের সাফল্যও বড় রকমের। কিন্তু এই যুদ্ধের একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। মুক্তিবাহিনী বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চল মুক্ত করছে এবং অসামরিক প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করছে। শহর ও ক্যান্টনমেন্টগুলোর উপর তারা কেবল চাপ অব্যাহত রেখেছে। কিন্তু কোথাও কোন বড় শহর এলাকা দখল করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। এটা সম্ভব হবে তখন, সাঁজোয়া ও বিমানবাহিনীর সহায়তায় তাঁরা যখন পূর্ণশক্তিতে আক্রমণ পরিচালনা করতে পারবেন। অন্যদিকে বাংলাদেশে অবস্থানকারী পাকিস্তানী সৈন্যেরাও মুক্তিবাহিনীর আক্রমণের মুখে পল্লী এলাকাগুলো—এমন কি সীমান্তের বিবর ঘাঁটিগুলো ছেড়ে শহর ও ক্যান্টনমেন্টে গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে এবং তাদের অবস্থান সুদৃঢ় করছে। বড় রকমের মুখোমুখি সংঘর্ষ তারাও যেন এড়িয়ে চলতে চাইছে এবং শক্তি সংহত করছে। ভারতীয় আকাশ-সীমা বার বার

লঙ্ঘন বা সীমান্ত অঞ্চলে অনবরত গোলাবর্ষণও এখন পর্যন্ত উস্কানিদানের এবং সীমান্ত সংঘর্ষের পর্যায়ে রয়েছে। ভারতের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও বড় রকমের শক্তিপরীক্ষা এখনও শুরু হয়নি।

তাহলে প্রশ্ন, এই উত্তেজনা সৃষ্টির এবং উত্তেজনা জিইয়ে রাখার আসল কারণ কী? সমস্যার এই জটটির কথাই আমি আগে উল্লেখ করেছি। এই জটটি হল, আগামী ডিসেম্বর মাস। এই ডিসেম্বর মাসে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার খসড়া শাসনতন্ত্র প্রকাশ করার কথা, জাতীয় পরিষদের বৈঠক ঢাকার বদলে ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা এবং সর্বোপরি একটি অসামরিক সরকারের হাতে বর্তমান সামরিক জুনটার ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা। এই ক্ষমতার লোভে পাকিস্তানে ভুট্টো ও নুরুল আমিন এখন কোমর বেঁধে কোন্দলে নেমেছেন। শক্তি সংগ্রহ ও তাঁর হাতেই ক্ষমতা হস্তান্তরে চাপ সৃষ্টির জন্য ভুট্টো স্বেচ্ছায় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার বিশেষ দূতের চাকরি নিয়েছিলেন এবং ছুটেছিলেন পিকিং-এ। অন্যদিকে বাঙ্গালী নুরুল আমিনকে সাক্ষীগোপাল খাড়া করে পশ্চিম পাকিস্তানের তিন মুসলিম লীগ, জামাতে ইসলামী, জমিয়তে উলেমায়ে ইসলাম, পাকিস্তান ডেমোক্রাটিক পার্টি প্রভৃতি রক্ষণশীল ও সাম্প্রদায়িক দলগুলো এক আট পার্টি জোট খাড়া করেছে। বর্তমান সামরিক জুনটা বাংলাদেশের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও আওয়ামী লীগকে বাদ দিয়ে যদি এই আট পার্টি জোট অথবা ভুট্টোর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রহসনের নামে একটি অসামরিক সরকার খাড়া করতে পারে এবং নিজেদের তৈরী শাসনতন্ত্র বলবৎ করতে পারে তাহলে এক ঢিলে তারা দুই পাখি মারবে। প্রথম, বিশ্ববাসীকে তারা বোঝাতে চাইবে পাকিস্তানে গণতন্ত্র ও অসামরিক শাসন-ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তিত হয়েছে। দ্বিতীয়, এই ধাপ্পার আড়ালে বাংলাদেশের স্বশাসনের দাবিটি এড়িয়ে স্থিতিশীল কেন্দ্রের নামে ক্ষমতার আসল লাটাই জুণ্টার জেনারেলদের হাতেই রেখে দেওয়া যাবে।

ডিসেম্বর একটি চরম সঙ্কটের মাস—এটা জেনেই বাংলাদেশ সরকার তাদের সীমিত সামর্থসত্ত্বেও নভেম্বরের শেষ পক্ষে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে মুক্তিবাহিনীর আক্রমণের তীব্রতা বহুগুণ বাড়াতে বাধ্য হয়েছেন। তাঁরা হয়তো জানেন, এই চাপ সৃষ্টির দ্বারা সর্বাত্মক সাফল্য লাভ করা যাবে না। কিন্তু শত্রুপক্ষকে বাংলাদেশের স্বার্থের ও অধিকারের অনুকূলে একটা ন্যায়-সঙ্গত রাজনৈতিক সমাধান মেনে নিতে বাধ্য করা যাবে, এমন একটা আশা তাদের মনে কাজ করে থাকতে পারে। অন্যদিকে পাকিস্তানের সামরিক জুনটার নেতারাও জানেন, এই ডিসেম্বর মাসই তাদের শেষ তুরুপের মাস। এই মাসে ইসলামাবাদ ও ঢাকায় তাদের পছন্দমত তথাকথিত অসামরিক সরকার প্রতিষ্ঠা ও বিশেষজ্ঞ দ্বারা তৈরী শাসনতন্ত্র বলবৎ করতে না পারলে বিশ্ব জনমতকে যেমন আর ধোঁকা দেওয়া যাবে না, তেমনি ভুট্টোসহ পশ্চিম পাকিস্তানের অসহিষ্ণু রাজনৈতিক নেতা ও জনগণকেও আর সন্তুষ্ট রাখা যাবে না। তখন ঘরে বাইরে বিপদ দেখা দেবে। কিন্তু দীর্ঘ আট মাস চেষ্টাব পরও তারা না পেরেছেন ঢাকায় একটি কার্যকর অসামরিক শাসন ব্যবস্থা চালু করতে, না পেরেছেন কেন্দ্রে ভুট্টো অথবা নুরুল আমিনের নেতৃত্বে তথাকথিত অসামরিক সরকার প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ থেকে আশানুরূপ সমর্থন সংগ্রহ করতে। ফলে সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ ভারতের বিরুদ্ধে উস্কানীমূলক যুদ্ধ তৎপরতা বৃদ্ধি এবং সবশেষে জরুরী অবস্থা ঘোষণা দ্বারা পশ্চিম পাকিস্তানে উগ্র ভারত-বিরোধী বিকার এমন স্তরে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে, যাতে ডিসেম্বরে ক্ষমতা হস্তান্তরের কাজটি সম্পন্ন না হলেও বিকারগ্রস্ত পশ্চিম পাকিস্তানী জনগণের মধ্যে কোন বড় রকমের বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা না দেয়। পাকিস্তানের জঙ্গী শাসকদের মনে এখন দুটি মাত্র আশা। যুদ্ধ নয়, যুদ্ধ-উত্তেজনার তীব্রতা বাড়িয়ে জাতিসঙ্ঘ অথবা বৃহৎ কোন শক্তির হস্তক্ষেপের আড়ালে বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান মুক্তিযুদ্ধের চাপ থেকে রক্ষা পাওয়া। অন্যথায়, ভারত-

বিরোধী উত্তেজনা জিইয়ে রেখে ডিসেম্বরের প্রতিশ্রুতি—ক্ষমতা হস্তান্তরের কাজটি এড়িয়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ব্যর্থ করার জন্য কালহরণের কৌশল অবলম্বন।

এই ব্যাপারে ইন্দিরা-সরকারের ভূমিকা থেকে এটা স্পষ্ট, তাঁরা যুদ্ধ পরিহার এবং বাংলাদেশ সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান সম্পর্কে এখনও আশা হারাননি। মুক্তিযুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধির চাপে পাকিস্তানের জঙ্গী চক্রের সুমতী ফিরবে এমন একটা আশা হয়ত তাঁরাও করেন। তাই বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতিদানের প্রশ্নটি শ্রীমতী ইন্দিরা সম্ভবত পাকিস্তানের জঙ্গীচক্রের মাথায় সূক্ষ্ম সূতোয় বাধ্য তরবারির মত ঝুলিয়ে রেখেছেন। সীমান্তে ভারত পর্বতের মত দৃঢ়তা সঙ্গে নিয়ে যে কোন আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য প্রস্তুত। অন্য-দিকে বাংলাদেশ সমস্যার ন্যায়সঙ্গত রাজনৈতিক সমাধানের দাবিতেও সে অনড়। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার এখন সাপের ছুঁচো গেলার মত অবস্থা। যদি তিনি বাংলাদেশের জনপ্রতিনিধি ও শেখ মুজিবুর রহমানকে এড়িয়ে ইসলামাবাদে ভুট্টো বা নুরুল আমিনকে দিয়ে তাঁবেদার সরকার প্রতিষ্ঠা করতে চান, তাহলে ভারত সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি প্রদান করবে। এই স্বীকৃতিদানের অর্থ কি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁ তা ভালো করেই জানেন। অন্যদিকে সামরিক এড্ভেনচার ছাড়া ভারতকে জব্দ করার জন্য কাশ্মীর বা রাজস্থানে আক্রমণ চালালে শুধু বাংলাদেশ সরকারের স্বীকৃতি ত্বরান্বিত হবে না, সর্বাত্মক যুদ্ধে পাকিস্তানের আত্মহত্যার পথও প্রশস্ত হবে। ইসলামাবাদে যতই চীনা সামরিক বিশেষজ্ঞ আসুক, ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ বাধলে চীন সরাসরি পাকিস্তানের পক্ষে যুদ্ধে লিপ্ত হবে না, এটা আজ পাকিস্তানের সামরিক জুনটার কাছে স্পষ্ট। তাহলে তাদের জন্য এখন পথ কোথায়?

আসলে এই উপায় এবং সমস্যা-মুক্তির পথ খোঁজার কাজেই

উন্মাদ হয়ে উঠেছে ইসলামাবাদের জঙ্গীচক্র। তাদের পরবর্তী পদক্ষেপের উপ্রই নির্ভর করছে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বড় রকমের প্রত্যক্ষ যুদ্ধ হবে কিনা? যদি না হয়, বিস্মিত হব না। যদি হয়, তাহলেও ডিসেম্বরের প্রথম কয়েকদিন নিরাপদ—এমন একটা ধারণা সম্ভবত পোষণ করা চলে।

আর দেরি নয়, যা করবার এখনই স্থির করতে হবে

বরুণ সেনগুপ্ত

বাংলাদেশ সম্পর্কে পাকিস্তানের নীতি এখন পরিষ্কার। প্রথমত, তারা বাংলাদেশের ক্যানটনমেণ্ট ও গ্যারিসন শহরগুলিকে যতদিন সম্ভব নিজেদের দখলে রাখার চেষ্টা করবে। দ্বিতীয়ত, তারা বাংলাদেশের ভিতরে রাষ্ট্রসংঘের পরিদর্শক বসিয়ে 'ভারতীয় হস্তক্ষেপের' অভিযোগ বিশ্বের দরবারে প্রচারের চেষ্টা করবে। এবং তৃতীয়ত, যদি বাংলাদেশ সরকার পাক সেনা বিতাড়নের জন্য ভারত সরকারের সাহায্য চায় ও যদি বাংলাদেশ সরকারের সেই আবেদন অনুসারে ভারতীয় সেনাবাহিনী বাংলাদেশের ক্যানটনমেণ্ট ও গ্যারিসনগুলি থেকে পাক সেনাদের উচ্ছেদ করতে অগ্রসর হয়, তাহলে পশ্চিম ভারতের উপর ঝটিতি আক্রমণ হানবে।

বাংলাদেশ সম্পর্কে পশ্চিমী বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির অর্থাৎ মারকিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন প্রভৃতির নীতি কী তাও এতদিনে পরিষ্কার। প্রথমত, তাঁরা স্বাধীন বাংলাদেশের সৃষ্টি চান না। তাঁরা চান, পূর্ববাংলা পাকিস্তানের মধ্যেই থাক। দ্বিতীয়ত, ভারত বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামীদের সাহায্য করুক এটাও তাঁরা চান না। তৃতীয়ত, মুক্তি-সংগ্রামীদের যাতে কিছুতেই ভারত সাহায্য না করতে পারে সেইজন্য তাঁরা ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে রাষ্ট্রসংঘের পরিদর্শক বসাতে চান। এবং চতুর্থত, তাঁদের এই নীতিগুলি মানাতে বাধ্য করার জন্য তাঁরা ভারত সরকারের উপর নানা ভাবে চাপ দিতে চান।

এই অবস্থায় ভারত সরকার কী করবেন সেইটাই এখন প্রধান-মন্ত্রীকে স্থির করতে হবে। পাকিস্তানী এবং পশ্চিমী বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির

নীতি যখন পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে, ভারত সরকারের নীতিও তখন পরিষ্কার হওয়া উচিত। ভারত সরকার চেয়েছিলেন, বাংলাদেশ সমস্যার একটা রাজনৈতিক সমাধান এবং তারপর এক কোটি শরণার্থীর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন। কিন্তু রাজনৈতিক অর্থাৎ আপোষ সমাধান যে হবে না, পাকিস্তান যে শেখ মুজিবরকে মুক্তি দিয়ে বাংলাদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সঙ্গে কোনও রফা করতে যাবে না ইয়াহিয়া-চক্র যে স্বাধীন বাংলাদেশ কিছুতেই মানবে না—এসব বিষয়ে এখন আর কারও মনে কোনও সংশয় থাকা উচিত নয়। এসব ব্যাপার এতদিনে নিশ্চয়ই সবাই বুঝতে পেরেছেন। এখন যত দিন যাবে ততই পাকিস্তান ও তার বন্ধুরা বাংলাদেশের সমস্যার আন্তর্জাতিক জটিলতা বাড়িয়ে তুলবে।

বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামীদের সামনে অবশ্য একটি ছাড়া দ্বিতীয় কোনও পথ খোলা নেই। বাংলাদেশকে পুরোপুরি মুক্ত করবার লড়াই তাঁদের চালিয়ে যেতেই হবে। ইয়াহিয়া খাঁ যখন কোনও রফায় রাজি নন, তিনি যখন সৈন্যবলে বাংলাদেশকে পাকিস্তানের পদাবনত রাখার অটল প্রতিজ্ঞা থেকে এক চুলও নড়বেনই না তখন বাংলাদেশের মুক্তি-সংগ্রামীদেরও স্বদেশকে মুক্ত করার জন্য শেষ পর্যন্ত লড়াই করে যেতেই হবে। যদি কেউ পাক শাসকদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে চান, তবে তিনি তা করতে পারেন, কিন্তু যিনি বাংলাদেশকে স্বাধীন করতে চাইবেন, যিনি পাকসৈন্য বাহিনীর কবল থেকে বাংলাদেশকে মুক্ত করতে চাইবেন তাঁকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মুক্তি-সংগ্রাম চালিয়ে যেতেই হবে। বাংলাদেশের সত্যিকারের মুক্তি সংগ্রামীদের জন্য দুটো পথ খোলা নেই।

বাংলাদেশ সম্পর্কিত আলোচনায় আজ আরও কয়েকটা সত্যি কথা বোধহয় খুব খোলাখুলি ভাবে আলোচনা করা ভাল।

প্রথমত মুক্তি-বাহিনী এখনও এত শক্তি সঞ্চয় করে নি যে তাঁরা

লড়াইয়ের কৌশলে শিক্ষিত ও আধুনিকতম-অস্ত্রে-সজ্জিত একটা নিয়মিত সেনাবাহিনীর সঙ্গে সম্মুখসমরে পেরে উঠবেন। পৃথিবীর কোথাও কোন দিন কোন মুক্তিবাহিনী জন্মের ছ-সাত মাসের মধ্যে এই শক্তি সঞ্চয় করতে পারেনি, পারে না। তার জন্য কম করে ছ'-সাত বছর লাগে।

দ্বিতীয়ত, একটা নির্দয় দখলকারী সেনাবাহিনীর সঙ্গে গেরিলা কায়দায় লড়াই চালাতে গেলেও নিয়মিত প্রচুর বিদেশী অস্ত্র সাহায্য চাই। বাংলাদেশের যা ভৌগোলিক অবস্থিতি তাতে একমাত্র ভারত বা ভারত মারফৎ ছাড়া মুক্তিবাহিনী এই নিয়মিত অস্ত্র সরবরাহ পেতে পারে না।

তৃতীয়ত, সীমান্তে ভারতীয় বাহিনীর চাপে ব্যস্ত বলে পাকসেনারা এখন বাংলাদেশের ভিতরের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সরে আসতে বাধ্য হয়েছে। সেইসব অঞ্চল এখন মুক্ত। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, পাকসেনাবাহিনী যদি যথেষ্ট শক্তি নিয়ে আবার ওইসব অঞ্চলগুলি দখল করতে এগিয়ে যায় তাহলে আঞ্চলিক মুক্তিবাহিনী তাদের প্রতিরোধ করতে পারে। এবং চতুর্থত, পাকসেনাবাহিনী যদি ঢাকা, যশোর, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি শহরে শক্ত ঘাঁটি করে বসে থাকতে চায় তাহলে মুক্তিবাহিনী একা তাঁর সর্বশক্তি নিয়োগ করেও এক-আধ বছরের মধ্যে ওইসব ঘাঁটি থেকে তাদের উচ্ছেদ করতে পারবে না।

এর মানে এই নয় যে, মুক্তিসেনাদের সাহসের কোনও অভাব আছে। মুক্তিসেনাদের বীরত্বের তুলনা নেই। স্বদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রাণ বিসর্জন দিতে যে তাঁরা এতটুকুও কুণ্ঠিত নন গত সাত মাসে হাজারে হাজারে বীরের মত প্রাণ দিয়ে তাঁরা তা প্রমাণ করেছেন।

কিন্তু আধুনিক যুদ্ধ শুধু বীরত্বের লড়াই নয়, আধুনিক যুদ্ধ প্রধানত অস্ত্র ও কৌশলের যুদ্ধ। মুক্তিসেনাদের হাতে সবচেয়ে ভারী অস্ত্র ছয় ইঞ্চি-মরটার। শুধু মরটার, মেসিনগান বা গ্রেনেড নিয়ে ট্যাংকে, কামানে, বিমানে শক্তিশালী শত্রুপক্ষকে পরাজিত করা যায় না।

বাংলাদেশে পাকবাহিনীর হাতে রয়েছে রকেট-সজ্জিত মারকিন স্যাবার জেট এবং স্যাফে ট্যাংক। রয়েছে পঁয়ত্রিশ মাইল পাল্লার ভারী রুশী কামান। আর রয়েছে অজস্র ছোট কিন্তু প্রচণ্ড শক্তিশালী চীনা কামান। এই বাহিনীর সঙ্গে সম্মুখ-সমরে নেমে তাদের ঘাঁটি থেকে উচ্ছেদ করার ক্ষমতা অর্জন করতে মুক্তিবাহিনীর এখনও অনেক দেরি আছে।

এই অবস্থায় ভারত সরকার কী করবেন তা প্রধানমন্ত্রীকে স্থির করতে হবে।

এটা খুবই পরিষ্কার যে, এখনই বাংলাদেশ থেকে পাকসেনাবাহিনীকে বিতাড়িত করতে হলে মুক্তিবাহিনীর ভারতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রত্যক্ষ ব্যাপক সাহায্য চাই। এবং সেজন্য ভারতীয় সেনা, বিমান এবং নৌবাহিনীকে বাংলাদেশের অনেকটা ভিতরে ঢুকে যেতে হবে। যশোর, কুমিল্লা, নাটোর, চট্টগ্রাম, ঢাকা প্রভৃতি পাক ঘাঁটিতে গিয়ে আক্রমণ করতে হবে। তাছাড়া এখনই পাকসেনাবাহিনীকে বাংলাদেশ থেকে উচ্ছেদ করা যাবে না।

এখনও পর্যন্ত বাংলাদেশের যুদ্ধটা যেভাবে চলছে সেভাবে অবশ্য ব্যাপক ভারতীয় অংশগ্রহণ ছাড়াও চলতে পারে। আরও বহুদিন ধরেই চলতে পারে। তাতে আরও 'বালুরঘাট' সৃষ্টি হলে, আরও বহু বিমান ঘাঁটির আগরতলার মত অবস্থা হবে। পাক গোলাগুলিতে প্রতিদিন বহু ভারতীয়ও প্রাণ হারাবেন।

ইতিমধ্যেই অবশ্য গোটা পশ্চিমী দুনিয়ার সংবাদপত্রগুলি বলতে শুরু করেছেন, ভারতীয় সেনাবাহিনী ব্যাপকভাবে পূর্ববাংলায় ঢুকেছে। এটা তাঁরা এখন বলেই চলবেন। চোখের সামনে মুক্তিসেনা দেখলেও এখন বহু পশ্চিমী সাংবাদিক বিশ্বাস করতে চাইছেন না তাঁরা সত্যিই বাঙালী মুক্তিসেনা। পাকবাহিনীর কাছ থেকে দখল করা চীনা মেসিনগানের গায়েও কোনও কোনও পশ্চিমী সাংবাদিক

ভারতীয় ছাপ খোঁজেন! এই প্রচার চলবেই। কারণ, এই প্রচারের উপর ভিত্তি করেই পশ্চিমী শক্তিগুলি এখন পাকিস্তানকে রক্ষা করতে চাইছেন।

এবং ইতিমধ্যে পাকবাহিনী বাংলাদেশে আরও শক্তি গেড়ে বসছে। ঘাঁটি শক্ত করার যত সময় তারা পাচ্ছে ততই ঘাঁটি দখলের লড়াইও কঠিন হয়ে উঠছে। ছয়মাস আগে যত সহজে যশোর ক্যাণ্টনমেণ্ট দখল করা যেত আজ যশোর দখল করতে তার অন্তত বিশগুণ শক্তি প্রয়োগ করতে হবে। বহুলোককে প্রাণও দিতে হবে।

এই অবস্থায় প্রধানমন্ত্রী কী করবেন তা তাঁকেই স্থির করতে হবে। ভারতের যাঁরা মিত্র বলে পরিচিত তাঁরা এই সময়ে ভারতের পাশে কতটা দাঁড়াতে রাজি, তা প্রধানমন্ত্রী ছাড়া বোধহয় আর কেউ জানেন না। আজকের আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে, বিশেষ করে বৃহৎ শক্তিবর্গের লীলাখেলার যুগে প্রত্যেকটি দেশকেই বিদেশের ব্যাপারে কোনও বড় কিছু করতে হলে নানাদিক ভেবে এগোতে হয়। ইন্দিরা গান্ধীকেও তাই করতে হবে। বিশেষ করে বাংলাদেশের ব্যাপারে কোনও বড় পদক্ষেপের ঝুঁকি যখন বিরাট, বাংলাদেশের ব্যাপারে আজ মারকিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীন যখন পাকিস্তানের মিত্র।

পূর্বখণ্ডে পাকিস্তানের মতলব কী

বরুণ সেনগুপ্ত

এবার চূড়ান্ত লড়াই শুরু হয়ে গিয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা সবদিক থেকে আক্রমণ করছেন। স্থল ও জলপথে পাক সেনাবাহিনীকে ঘিরে ধরার জন্য মুক্তি সেনারা এগিয়ে যাচ্ছেন। পাকিস্তানী বিমানবাহিনী যদি পূর্ববাংলায় বেশি সক্রিয় হয় তাহলে অল্প কিছুদিনের মধ্যে স্বাধীন বাংলার বিমান বাহিনীও প্রতি আক্রমণ চালাবে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের এটা চূড়ান্ত পর্যায়। ২৫শে মার্চ রাত্রে অতর্কিতে গোটা বাংলাদেশের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে পাক সামরিক নায়করা যে লড়াই শুরু করেছিলেন এবার তার চূড়ান্ত পর্যায় এসে গিয়েছে। এবার প্রায় গোটা বাংলাদেশে পাক সেনা-বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে মুক্তি সেনারা।

পাক সামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের এই চূড়ান্ত লড়াইটা আচমকা কিছু নয়। দীর্ঘদিন ধরে তারা এই আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। তারা হয়ত মনে মনে আশা করেছিল যে বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারা তেমন শক্তি সঞ্চয় করতে পারবে না, তারা নানা বন্ধু মারফৎ ভারতের উপর চাপ এনেছিল যাতে ভারত তেমনভাবে বাংলাদেশের মুক্তি-সংগ্রামকে সাহায্য না করে, তারা হয়ত ভেবেছিল প্রতিপক্ষ তাদের সুসজ্জিত সেনাবাহিনীর সঙ্গে সম্মুখ সমরে নামবে না।

কিন্তু এইসব ভাবনা চিন্তা এবং চেষ্টা তদবির সত্ত্বেও পাক সামরিক কর্তৃপক্ষ বড় আক্রমণে আত্মরক্ষার পরিকল্পনা করতে ভোলেনি। চূড়ান্ত লড়াইয়ের জন্য তারা একটা পরিকল্পনা করে রেখেছিল।

সেই পরিকল্পনা মত সব ব্যবস্থাও হচ্ছিল। ত্রিশ মাইল পাল্লার কামানও এনেছে। এখন তারা পূর্ব পরিকল্পনা মতই লড়াইটা পরিচালনা করছে। চূড়ান্ত পর্যায়ে পাক সেনাবাহিনীর লড়াই দেখে সবাই বুঝতে পারছেন এটা পূর্বপরিকল্পিত আত্মরক্ষার ব্যবস্থা।

এই পূর্ব-পরিকল্পিত আত্মরক্ষার ব্যবস্থাটা কী? আপাতত দেখা যাচ্ছে পূর্ববাংলায় পাকিস্তানীরা চার পাঁচটি শক্ত ঘাঁটি তৈরি করে সেখানে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করতে চাইছে। এই ঘাঁটিগুলি তৈরি হচ্ছে ক্যাণ্টনমেণ্ট শহরকে কেন্দ্র করে। পূর্ববাংলায় পাকিস্তানের প্রায় সাড়ে চার ডিভিশন বা প্রায় আশী হাজার নিয়মিত সেনা আছে। এই সেনাবাহিনীকে পাক সামরিক নেতারা আস্তে আস্তে ওই ঘাঁটিগুলিতে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। সবচেয়ে বড় ও শক্ত ঘাঁটি তৈরির চেষ্টা হচ্ছে ঢাকা শহর ও কুরমিটোলা ক্যাণ্টনমেণ্টকে কেন্দ্র করে। সেখানে প্রায় দুই ডিভিশন সৈন্য নিয়ে পাক সেনা-বাহিনী তার শেষ দুর্গ তৈরি করছে। পাক কর্তৃপক্ষ পূর্ববাংলা থেকে সম্পূর্ণ পলায়নের আগে পর্যন্ত ঢাকাকে দখলে রাখতে চায়।

দুটো উদ্দেশ্যে পাকিস্তান এই কাজ করে থাকতে পারে। (এক) তারা পূর্ববাংলার যথাসম্ভব ভিতরে মুক্তিবাহিনীকে টেনে নিয়ে গিয়ে তারপর নিজ ঘাঁটির সামনে সর্বশক্তি নিয়ে লড়াই করার জন্য এই ব্যবস্থা করে থাকতে পারে। এবং (দুই) তারা অন্য কোনও বৃহৎ পরিকল্পনামত কাজ শুরু করার আগে সময় পাওয়ার জন্য এই আত্মরক্ষার শক্ত ব্যূহ রচনা করে থাকতে পারে।

মারচেও পাক সেনাবাহিনী পূর্ববাংলায় পুরোপুরি না হলেও অনেকটা এই কৌশলই অবলম্বন করেছিল। যখন দেখল নানাদিক থেকে আক্রান্ত তখন ২৭ মারচই গোটা পূর্ববাংলার সব রণক্ষেত্র ছেড়ে পাক সেনাবাহিনী ক্যানটনমেনটে এবং গ্যারিসনগুলিতে ঢুকে গেল। তারপর প্রায় ছ দিন ধরে তারা অপেক্ষা করল সেখানে। গোটা

পূর্ববাংলা তখন কার্যত স্বাধীন। কিন্তু তখন মুক্তিবাহিনী কোনও সুসংগঠিত সেনাদল নয়, লড়াইয়ের অভিজ্ঞতাও তাদের নেই এবং সর্বোপরি হাতে ভারী অস্ত্রশস্ত্র ছিল না। মুক্তিবাহিনী বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন ক্যানটনমেনট আক্রমণ করে কিছু করতে পারলেন না। খুব দ্রুত পশ্চিম পাকিস্তান থেকে অস্ত্রশস্ত্র এবং সৈন্য এল। চট্টগ্রাম ঢাকা এবং চালনা দিয়ে সেই নবাগত পাক-সেনাবাহিনী এগিয়ে গিয়ে ক্যানটনমেনট ও গ্যারিসনের সেনাবাহিনীর সঙ্গে যোগ দিল। এবং আস্তে আস্তে আবার প্রায় গোটা পূর্ববাংলায় ছড়িয়ে পড়ল।

এবার অবশ্য তেমন সুযোগ পাক সামরিক বাহিনীর নেই। কারণ, বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারা এখন একটা বিরাট ও সুসংহত সেনাবাহিনী। তাঁদের হাতেও এখন যথেষ্ট অস্ত্রশস্ত্র রয়েছে। আর, পাক সামরিক কর্তৃপক্ষের পক্ষেও এখন পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ববাংলায় সৈন্য সরিয়ে আনা সম্ভব নয়। সুতরাং এবার পাক সেনাবাহিনীর পক্ষে আগের বারের কৌশল অবলম্বন করা সম্ভব নয়।

আপাত দৃষ্টিতে এও মনে হতে পারে যে পাকিস্তানী সমরনায়করা পূর্ববাংলা থেকে "সাফল্যজনক পলায়নের" জন্যই এই কৌশল অবলম্বন করেছে। চার পাঁচটা ঘাঁটিতে তারা সমবেত হচ্ছে। সেইখানে যতদিন সম্ভব আত্মরক্ষা করবে। এবং, সেইসব ঘাঁটি থেকে নিজেদের যত বেশি সম্ভব লোকজন ও জিনিসপত্র বিমানপথে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাবে। পূর্ববাংলা ছেড়ে যাওয়ার আগে প্রধানত বিমানপথে অন্তত দু-তিন লক্ষ লোককে তাদের নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতেই হবে।

কিন্তু পাকিস্তানী সমরনায়করা কি এত সহজে পূর্ববাংলা ছেড়ে চলে যাবে? আমার কিন্তু তা মনে হয় না। তা যদি তারা চাইত তা হলে তো লড়াই ছাড়াই বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে রফা করতে পারত। শুধু পূর্ববাংলায় বাংলাদেশের লড়াই যে তারা কিছুতেই জিততে পারবে না এটা না-বোঝার মত বোকা পাকিস্তানী

সমরনায়করা নয়। পূর্ববাংলাকে নিজেদের তাঁবে রাখার জন্য শেষপর্যন্ত তারা চেষ্টা করবেই। এবং এইজন্য পাকিস্তানের নিশ্চয়ই কোনও বড় পরিকল্পনা আছে।

সেই পরিকল্পনার ভিত্তি খুব সম্ভব ভারত আক্রমণ। পাকিস্তানের সমরনায়করা জানে, এখনও যা পরিস্থিতি তাতে শুধু ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্ববঙ্গ অভিযানের অভিযোগ তুলে আন্তর্জাতিক "মধ্যস্থতার" ব্যবস্থা করা যাবে না। তাই পাকিস্তান এখনও পর্যন্ত পূর্ববাংলার ব্যাপারে নিরাপত্তা পরিষদের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করে নি। সম্ভবত, ভারতের সঙ্গে পুরোদমে লড়াই লাগিয়ে দিয়ে তারপর তারা সেই পথে যাবে। এবং ওইভাবে পূর্ববাংলায়ও যথাসম্ভব কর্তৃত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করবে।

হতে পারে সেইজন্য পাকিস্তানের এখনও দুচারদিন সময় চাই। ভারতের সঙ্গে লড়াই করতে হলে পাকিস্তানকে তা করতে হবে পশ্চিমে। পুবে ভারতের সঙ্গে লড়াই করতে যাওয়া পাকিস্তানের পক্ষে অর্থহীন। অবশ্য, যদি দ্রুত বিদেশী শক্তির হস্তক্ষেপের ব্যবস্থা না করা যায় তাহলে ভারতের সঙ্গে কোথাও যুদ্ধে যাওয়াই পাকিস্তানের পক্ষে মুর্খামি। কারণ, ভারত পাকিস্তানের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী।

তাই পাকিস্তান চাইবে ঝটিতি আক্রমণ এবং দ্রুত ফললাভ। আর তার পরই বিদেশী হস্তক্ষেপ। পাকিস্তানের পক্ষে এবার স্থলপথে পশ্চিম সীমান্তে আক্রমণ করেও দ্রুত ফললাভ সম্ভব নয়। কারণ, এবার পশ্চিম সীমান্তেও ভারতীয় বাহিনী সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

পাকিস্তান তাই একমাত্র আকস্মিক ব্যাপক বিমান আক্রমণের মাধ্যমে এই দ্রুত ফললাভের চেষ্টা করতে পারে। এই আক্রমণ যদি তারা করে তাহলে দুদিকেই করবে—পূর্বেও, পশ্চিমেও। সেই সঙ্গে সঙ্গে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ঢুকিয়ে দেওয়া কয়েক হাজার পাক-চরও নাশকতার কাজে সক্রিয় হয়ে উঠবে।

যেভাবেই করুক, পাকিস্তান শেষ পর্যন্ত পূর্ব বাংলাকে দখলে রাখার চেষ্টা করবেই এবং সেইজন্য বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে নিয়ে যাওয়া ছাড়া তার পথ নেই। পাকিস্তানের কর্তারা কিন্তু এখনও এই বিরাট আত্মঘাতী সংঘর্ষকে এড়াবার ব্যবস্থা করতে পারেন। বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ও অন্যান্যদের স্বদেশে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা এখনও অসম্ভব নয়। কিন্তু পাকিস্তানীরা তাতে রাজি নয়। তাই তারা গোটা জিনিসটাকে টেনে ভারত-পাক সংঘর্ষে নিয়ে যাবেই। এবং সেজন্য তারা চাইবে প্রধানত আকস্মিক বিমান আক্রমণের পথ ধরতে!

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামেও যেমন আমাদের দায়িত্ব রয়েছে তেমনি পাকিস্তানের এই ভারত-আক্রমণের ব্যাপারেও আমাদের বিরাট দায়িত্ব রয়েছে। নানা বিচারে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধও আমাদের আত্মরক্ষার সংগ্রাম। পাকিস্তান ভারত আক্রমণ করলে সেটা তো সোজাসুজি আমাদেরই লড়াই হয়ে দাঁড়াবে।

এই লড়াই যেমন সামরিক বাহিনীর, এই লড়াই তেমনি জন-সাধারণেরও। এই লড়াইয়ে সামরিক এবং অসামরিক প্রতিরক্ষা দুই-ই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দুয়েরই বিরাট ভূমিকা। একে অপরের পরিপূরক হিসাবে কাজ না করলে সাফল্য আসতে পারে না।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার আগে যুদ্ধবিরতি নয়

শংকর ঘোষ

রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ সভায় ও নিরাপত্তা পরিষদে ভারত-পাকিস্তান-বাংলাদেশ যুদ্ধের উপর একদফা আলোচনা হয়ে গেল। এই যুদ্ধে বাংলাদেশও যে এক সরিক তা রাষ্ট্রপুঞ্জ স্বীকার করেনি; করতে পারেও না, কারণ তা হলে মেনে নিতে হয় যে খানেদের পাকিস্তান খান খান হয়েছে।

রাষ্ট্রপুঞ্জ যেমন একদিকে আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকারে বিশ্বাসী তেমনি অন্যদিকে বিশ্বাসী সদস্য রাষ্ট্রগুলির ভৌগোলিক অখণ্ডতায়। বাংলাদেশ সম্পর্কিত বিরোধ প্রধানত এই দুই মৌলিক ধারণার অন্তর্দ্বন্দ্ব। যাঁরা বাংলাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারে বিশ্বাস করেন যাঁরা মনে করেন গত আট মাসের অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের জনসাধারণ প্রমাণ করেছেন এই অধিকার বাংলাদেশের স্বাধীনতা ছাড়া অন্য কোন উপায়ে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নয় তাঁরা বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামকে স্বাগত জানিয়েছেন। তাঁরা এই সংগ্রামের সফলতা কামনা করছেন, যদিও তাঁরা জানেন মুক্তি সংগ্রামের সাফল্যের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি পাকিস্তানের অঙ্গচ্ছেদ।

রাষ্ট্রপুঞ্জের অধিকাংশ সদস্যই এই মতাবলম্বী নন। তাঁরা অগ্রাধিকার দিয়েছেন সদস্য রাষ্ট্রগুলির ভৌগোলিক অখণ্ডতা রক্ষার দায়িত্বকে। তার ফলে বাংলাদেশের সাড়ে সাতকোটি মানুষের আত্মত্যাগ ও রক্তক্ষয় তাঁদের কাছে অর্থহীন মনে হয়েছে। ভৌগোলিক পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্য দেখাতে গিয়ে তাঁরা বর্তমানের বাস্তবকে অস্বীকার করেছেন, বাংলাদেশে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অভূতপূর্ব অত্যাচার মাফ করেছেন।

অবশ্য সব রাষ্ট্রই যে বাংলাদেশ সমস্যাকে এই দুই আপাত-বিরোধী নীতির লড়াই হিসাবে দেখেছেন তা নয়। তা দেখলে তাঁরা হয়ত বুঝতেন, যে-ভৌগোলিক সত্তা রক্ষার জন্য লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ নিঃসহায় নরনারীকে হত্যা করতে হয় এবং এক কোটি লোককে সর্বস্বান্ত অবস্থায় দেশ ত্যাগ করতে হয় সে-সত্তার পিছনে কোন নৈতিক যুক্তি থাকতে পারে না। এই গণ-দুর্দশাই প্রমাণ করে সেই ভৌগোলিক সত্তা জনসাধারণের অভিপ্রেত নয়।

যদিও রাষ্ট্রপুঞ্জে যখন কোন সমস্যা উত্থাপিত হয় তখন সদস্য রাষ্ট্রগুলির সেটিকে রাষ্ট্রপুঞ্জের সনদের কষ্টিপাথরে বিচার করার কথা, কার্যক্ষেত্রে তা খুব কম সময়ই ঘটে। রাষ্ট্রপুঞ্জের অধিকাংশ সদস্যই সমস্যাটির বিচার করেন তাঁদের নিজস্ব জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে, রায় দেন সেইভাবে যাতে তাঁদের জাতীয় স্বার্থ রক্ষিত হয়। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। যাঁরা স্বাধীন বাংলাদেশকে তাঁদের জাতীয় স্বার্থের প্রতিকূল মনে করেন তাঁরা পৃথিবীর এই নবতম রাষ্ট্রের অস্তিত্বই স্বীকার করেননি; সাড়ে সাত কোটি লোকের দাবীকে অগ্রাহ্য করে তাঁরা বর্তমান যুদ্ধকে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ বলে দুই দেশকে অস্ত্র সংবরণের নির্দেশ দিয়েছেন। এই উপমহাদেশের বাস্তবকে উপেক্ষা করতে যাঁদের বিবেকে বেধেছে, যাঁরা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পৃথিবীর বৃহত্তম মুক্তি সংগ্রামকে একটি নিছক আন্তর্জাতিক চক্রান্ত বলে মনে করেননি তাঁরা রাষ্ট্রপুঞ্জের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সঙ্গে একমত হতে পারেননি। তাঁরা রাষ্ট্রপুঞ্জে যে-প্রস্তাব পাশ হয়েছে তার বিরোধিতা করেছেন।

যে অল্প কয়েকটি দেশ কোন পক্ষেরই সামিল হয়নি তার মধ্যে আছে বৃটেন ও ফ্রান্স। নতুন ফ্রান্সের প্রতিষ্ঠাতা দ্য গল গেছেন, কিন্তু তাঁর প্রভাব এখনও আছে। দ্য গল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর ফ্রান্সকে আমেরিকা ও বৃটেনের ল্যাংবোটে পরিণত হতে দেননি। একালের মিত্রদের সমস্ত ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে তিনি স্বতন্ত্র নীতি

অনুসরণ করেছিলেন ; তিনি যে ভুল করেননি তার প্রমাণ ফ্রান্সের বর্তমান সমৃদ্ধি। রাষ্ট্রপুঞ্জে ফ্রান্স যে আমেরিকা ও চীনের নেতৃত্বে সংখ্যাগরিষ্ঠের নির্দেশ মেনে নেয়নি তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

কিন্তু বৃটেনের নিরপেক্ষতা আশ্চর্যকর। পাকিস্তান বৃটেনের সৃষ্টি এবং ভারত-পাকিস্তান বিরোধে বৃটেন তার এই মানসপুত্রটিকে বরাবর সমর্থন করে এসেছে। অথচ এবার যখন পাকিস্তানের অস্তিত্ব পর্যন্ত বিপন্ন তখন বৃটেন নিরপেক্ষ। এর একটি কারণ হতে পারে এই উপমহাদেশের আভ্যন্তরিক অবস্থার সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয় থাকার ফলে বৃটেন বুঝেছে, বাংলাদেশকে বাদ দিয়ে সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। বাংলাদেশের অস্তিত্ব অস্বীকার করে কেবল ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব করলে ভারত তা প্রত্যাখ্যান না করলেও সে যুদ্ধবিরতি অর্থহীন হবে কেননা বাংলাদেশের মুক্তি যোদ্ধারা সে-প্রস্তাব মানবে না। রাষ্ট্রপুঞ্জে নিরপেক্ষ থেকে বৃটেন সম্ভবত যুদ্ধবিরতি ও রাজনৈতিক সমাধানের জন্য তার মধ্যস্থতার পথ খোলা রেখেছে।

রাষ্ট্রপুঞ্জের সদস্যদের যে বিরাট অংশ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে অস্বীকার করে কেবল ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধবিরতি ও সৈন্য অপসারণের পক্ষে রায় দিয়েছেন, তাঁদের চাঁই আমেরিকা ও চীন। এই দুই বৃহৎ শক্তির সঙ্গে ছোটখাট যেসব দেশ জোট বেঁধেছে তারা সকলেই যে এক কারণে এই নীতি অবলম্বন করেছে তা নয়। কেউ হয়ত ধর্মীয় কারণে পৃথিবীর বৃহত্তম ইসলামিক রাষ্ট্রের দ্বিধাবিভক্তি চায় না, কেউ হয়ত নিজের আভ্যন্তরিক অবস্থার কথা চিন্তা করে এমন কিছু করতে চায় না যার প্রভাব তার নিজের এলাকার গণ-আন্দোলনের উপর পড়তে পারে।

এই সব সঙ্কীর্ণ স্বার্থবুদ্ধিকে সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার সুযোগ দিয়েছে চীন ও আমেরিকা। আমেরিকা ও চীনের মধ্যে কে কাকে নেতৃত্ব দিচ্ছে তা নিয়ে বিতর্ক উঠতে পারে। যদিও চীনের সঙ্গে আপস আলোচনায়

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে আমেরিকার উপস্থিতির অবসানের পর এই অঞ্চলে বৃহৎ শক্তিগুলির কী ভূমিকা হবে সে সম্বন্ধে চীন ও আমেরিকার একটি প্রাথমিক আলোচনা নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে হয়েছে এবং যদিও আমেরিকা ও চীন দু'জনেই ভারত-সোভিয়েট মৈত্রী চুক্তিকে তাদের পরিকল্পিত শক্তি-সাম্যের বিঘ্নস্বরূপ মনে করে, তাহলেও বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলন সম্পর্কে তাদের মনোভাব শুরু থেকে এক নয়।

আমেরিকার আগেই চীন বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের বিরোধিতা করেছে। মুক্তি সংগ্রামের প্রথম তিন মাস আমেরিকা সে সম্বন্ধে নীরব ছিল এবং অন্য অনেক দেশের মতোই এটিকে পাকিস্তানের আভ্যন্তরিক সমস্যা বলে অভিহিত করেছিল। আমেরিকার মনোভাব পরিবর্তনের প্রথম লক্ষণ প্রকাশ পায় প্রেসিডেন্ট নিকসনের ব্যক্তিগত দূত হিসাবে ডঃ কিসিংগারের প্রথম চীন সফরের পর। ডঃ কিসিংগার দ্বিতীয়বার পিকিং যান যখন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ইউরোপ-আমেরিকা সফর করছেন। সকলেরই স্মরণ থাকার কথা যে, ডঃ কিসিংগারের প্রত্যাবর্তনের পর থেকেই আমেরিকা খোলাখুলি ভাবে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করছে।

এই ঘটনা পরম্পরা থেকে সন্দেহ হতে পারে, আমেরিকার মনোভাবের পিছনে চীনের প্রভাব আছে। আগামী বছরের নির্বাচনে জেতার জন্য প্রেসিডেন্ট নিকসনের প্রয়োজন ভিয়েতনাম থেকে সৈন্যপসারণ। এই অপসারণের মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে যদি তার ফলে ইন্দোচীন দেশগুলির বর্তমানের অস্থির ও অনিশ্চিত শান্তিও বজায় না থাকে। তার জন্য আমেরিকার প্রয়োজন চীনের সহযোগিতার। চীন এই সহযোগিতার মূল্য চায়।

যে ঘটনা সমাবেশে বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হতে চলেছে তার প্রভাব বাংলাদেশের স্বাধীন সরকারের নীতির উপর অনিবার্য। সে সরকার স্বভাবতই ভারত ও সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে সম্প্রীতি রেখে চলবে। চীন মনে করে, এই শক্তি-সমন্বয় তার পক্ষে ক্ষতিকর

হবে। তাই আমেরিকার সহায়তায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সে ব্যর্থ করতে আগ্রহী। প্রেসিডেণ্ট নিকসন চীনের সঙ্গে সমঝোতার জন্য এত ব্যগ্র যে তিনি সহযোগিতায় রাজী হয়েছেন। আমেরিকায় সর্বশেষ কয়েকটি ঘটনা থেকে মনে হয় তিনি এ বিষয়ে বিশেষ কয়েকজন ছাড়া আর কারও সঙ্গে পরামর্শ পর্যন্ত করেননি।

চীনা মনোভাবের আরও একটি কারণ থাকতে পারে, যার ইঙ্গিত রাষ্ট্রপুঞ্জে চীনা প্রতিনিধি দিয়েছেন। তিনি তিব্বতে বিদ্রোহী ও বিভেদকামীদের সাহায্য করার জন্য ভারতের উপর দোষারোপ করেছেন; তেমনি করেছেন সোভিয়েট ইউনিয়নের উপর সিংকিয়াং অঞ্চলে তথাকথিত রুশ হস্তক্ষেপের জন্য। চীনের ভয় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করলে তার প্রান্তীয় অঞ্চলের বিক্ষোভ কঠোরহস্তে দমন করার কোন নৈতিক যুক্তি চীন সরকারের থাকবে না। সত্যই যদি তাই হয় তাহলে বলতে হবে বিপ্লবের দুই দশক পরেও চীনে আভ্যন্তরিক স্থিতি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। চীনে এখনও বিক্ষোভ ধূমায়মান, চীনের সামরিক শক্তি আভ্যন্তরিক শান্তি, সমৃদ্ধি ও সন্তোষের দ্বারা পুষ্ট নয়।

তবে বর্তমান অবস্থায় চীন ও আমেরিকার পাকিস্তান প্রীতি মৌখিক পর্যায় থাকারই সম্ভাবনা। যে দেশ এত বছর যুদ্ধের পর ভিয়েতনাম থেকে পালিয়ে আসতে চায় সে-দেশ নতুন করে অন্য কোন দেশে সেনাবাহিনী পাঠাবে মনে হয় না। প্রেসিডেণ্ট নিকসনের যদি সে রকম কোন বাসনা থাকেও, আমেরিকান সেনেটের বৈদেশিক সম্পর্ক কমিটি আগেভাগে তাতেও বাদ সেধে রেখেছেন। এই সপ্তাহেই এই কমিটি সর্বসম্মতিক্রমে একটি বিল অনুমোদন করেছেন যার ফলে পৃথিবীর কোন জায়গায় আমেরিকান সৈন্য পাঠানোর আগে প্রেসিডেণ্টকে কংগ্রেসের সম্মতি নিতে হবে। এই সাধারণ নিয়মের কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমের ব্যবস্থাও বিলে আছে তবে বিলটিতে যে প্রেসিডেণ্টের ক্ষমতা অনেক খর্ব করা হয়েছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় নিকসনপন্থীদের ঘোর বিরোধিতায়।

দেশে দেশে মুক্তি সংগ্রামের যত বড় পৃষ্ঠপোষকই চীন হোক না কেন একমাত্র কোরিয়া ছাড়া আর কোথাও চীনা সেনা সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেনি। কোরিয়ায় করেছিল, কারণ চীনই তখন আক্রান্ত। পাকিস্তানের ক্ষেত্রে চীন এই নীতির ব্যতিক্রম করবে মনে হয় না। আমেরিকার মতোই চীন পাকিস্তানকে অস্ত্র সাহায্য করছে। কিন্তু তাছাড়া চীন আর কোনও সাহায্য করবে কিনা তা নাকি দু'একদিনের মধ্যে জানা যাবে। অর্থাৎ এই সাহায্য ঘোষণা করা হবে বাংলাদেশ মুক্ত হওয়ার পর যখন সাহায্য পাওয়া না পাওয়া পাকিস্তানের পক্ষে সমান কথা।

এসব পর্যালোচনা করেই ভাবত সরকার তাঁব নীতি স্থির করেছেন এবং রাষ্ট্রপুঞ্জের যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান কবেছেন। ঐ প্রস্তাবে পাকিস্তানের সর্তাধীন সম্মতির পবও এ নীতি পরিবর্তনেব কোন কারণ নেই। পাকিস্তান কেবল সম্মতিই জানিয়েছে, যুদ্ধবিরতি করেনি। যুদ্ধের বর্তমান অবস্থায় পাকিস্তানের সম্মতি আত্মসমর্পণ ছাড়া কিছু নয়। এই সম্মতির একটি উদ্দেশ্য হল ভারত যদি অনুরূপ মনোভাব দেখায় তাহলে বাংলাদেশের মুক্তি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। যুদ্ধ করে পাকিস্তান যে ফল পায়নি, যুদ্ধবিরতি করে তা পাবে। আর ভারতের মনোভাব যদি অপরিবর্তিত থাকে তাহলে নিরাপত্তা পরিষদের আসন্ন অধিবেশনে ভারতকে যুদ্ধবাজ বলার আব একটি অছিলা সৃষ্ট হবে। ভারতের পক্ষে রাষ্ট্রপুঞ্জের দরবারে বিনাদোষে অভিযুক্ত হওয়া এই প্রথম নয়। কিন্তু এই প্রথম ভারত সেই অন্যায়কে উপেক্ষা করার মনোবল দেখিয়েছে। সেই মনোবল যতদিন বাংলা-দেশ সম্পূর্ণরূপে পাকিস্তানী ফৌজের কবলমুক্ত না হয় ততদিন প্রয়োজন। যুদ্ধবিরতি যদি হয় তাহলে তা হবে পশ্চিম রণাঙ্গনে বাংলাদেশের মুক্তির পর। তার আগে যুদ্ধবিরতির কোন প্রস্তাব বিবেচনা ভারত সরকারের গত আট মাসের সফল নীতির পরিপন্থী হবে।

কেন ব্যর্থ হল পাকিস্তানের অতর্কিত বিমান হানা

প্রফুল্ল চন্দ

গত ৩রা ডিসেম্বর শুক্রবার ভারতের উপর ব্যাপক এবং অতর্কিত বিমান হানা দিয়েছিল পাকিস্তান। এই আক্রমণটা মোটেই অপ্রত্যাশিত ছিল না। ১৯৬৭ সালে আরব-ইস্রাইল লড়াই-এ পথ দেখিয়েছিল ইস্রাইল। আচমকা আক্রমণে তার বিমান বন্দর মাটিতেই গুড়িয়ে দিয়েছিল গোটা আরবের বিমান শক্তি। অবশিষ্ট যা ছিল তা খুবই সামান্য। এর অবশ্যম্ভাবী পরিণাম—ছ' দিনেই মিশরের ধুলিশয্যা এবং ইস্রাইলের চূড়ান্ত বিজয়।

যুদ্ধে ভারতকে পর্যুদস্ত করার সখ বহুদিন ধরে পাকিস্তানের মনে দানা বেধে উঠেছিল। ইস্রাইলী বিমান বহরের অভাবনীয় সাফল্যের মধ্যে পাক সমর নায়কেরা পেয়েছিলেন স্বপ্ন প্রেরণা। সযত্নে বেছে নিয়েছিলেন তারা ইস্রাইলী পথ। এই পথকে সুপ্রশস্ত করার ভার পড়েছিল বৃটেন এবং আমেরিকার উপর। গত ক'দিন ধরেই এ দুটি দেশের পত্র-পত্রিকাগুলো বলে বেড়াচ্ছিল—আক্রমণকারী হিসাবে আখ্যায়িত হতে চলেছে ভারত। বাংলাদেশে ঢুকেছে তার সৈন্যদল। এ ধরণের প্রচারের প্রধান উদ্দেশ্য, নয়া-দিল্লীকে ঠেকিয়ে রাখা। তারা যাতে প্রথম আক্রমণের প্রাথমিক সুযোগ না পান তার ব্যবস্থা করা। এসব কুচক্রীর আড়াল থেকে প্রথম আঘাত হেনেছে পাকিস্তান। বৃটেন এবং আমেরিকার এই নক্কারজনক ভূমিকা নূতন নয়। ১৯৬৭ সালে মার্কিন কর্তৃপক্ষ মিশরকে দিয়েছিলেন প্রতিশ্রুতি—ইস্রাইল কখনই প্রথম আক্রমণ করবে না। প্রেসিডেন্ট নাসের কথা দিয়েছিলেন —তিনি এগিয়ে গিয়ে লড়াই বাধাবেন না। আমেরিকাকে বিশ্বাস

করে ঠকেছিল মিশর। প্রথম আক্রমণের সুযোগ হারিয়েছিল সে। রণক্ষেত্রে নিদারুণ বিপর্যয়ের মধ্যে এ ভুলের খেসারত দিতে হয়েছিল তাকে। এই পুরানো নীতিই ভারত সম্পর্কে অনুসরণ করতে চেয়েছিল বৃটেন এবং আমেরিকা। পাকিস্তানকে পরিয়েছিল তারা ইস্রাইলী বেশ।

পোষাকটা খুবই বেমানান। পাকিস্তান আর যাই হোক, নিশ্চয়ই ইস্রাইল নয়। আর ভারতও কোন মতেই মিশর নয়। ১৯৬৭ সালে মিশরীয় বৈমানিকদের শিক্ষা ছিল অসম্পূর্ণ। বিমান বহরের নায়কেরা ছিলেন আনাড়ী এবং দায়িত্বজ্ঞানশূন্য। সীমান্তে যখন চলছিল উত্তেজনা তখন মিশরীয় সমর নায়কেরা নিশ্চিন্ত মনে খেলতেন টেনিস। রাণওয়েগুলোর উপর সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে থাকত জঙ্গী বিমানগুলো। অদূরে বসে বসে ঝিমুত বৈমানিকরা। পালা করে দু-একটি বিমান আকাশে উঠত। রাত্রিতে বিমান চালাতে ওরা ছিল একেবারেই নারাজ। এই অসতর্ক অবস্থাতেই ইস্রাইল পেয়েছিল মিশরীয় বিমান বহরকে। ইলেকট্রনিক কৌশলে বিভ্রান্ত করেছিল রেডারগুলোকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষের দিকে জার্মানীর বিরুদ্ধে এ পদ্ধতির প্রয়োগ দেখা গিয়েছিল বৃটেনে। তা থেকে শিখে নিয়েছিল ইস্রাইলীরা। এসব উন্নত ধরণের যুদ্ধবিজ্ঞান মিশরের অজানা। পাকিস্তানের সমর নায়ক এবং বৈমানিকরা বুদ্ধিতে ও শিক্ষা-দীক্ষায় ইস্রাইলীদের ধারে কাছে আসতে পারে না। তাদের প্রতিপক্ষ ভারত। যুদ্ধের অভিজ্ঞতা তার প্রচুর। বৈমানিকরা বিশ্বের সেরা বৈমানিকদের শ্রেণীভুক্ত। বিরাট ভূভাগের মধ্যে ছড়িয়ে আছে ভারতীয় বিমান বহর। তাদের সতর্কতায় ঢিলে পড়েনি কোনদিন। এদের উপরই অতর্কিত আক্রমণ চালিয়েছে পাক বিমান বহর। পরে দেখা গিয়েছে, ক্ষতির পরিমাণ সামান্য। ক' ঘণ্টার মধ্যেই প্রচণ্ড প্রত্যাঘাত তার প্রমাণ। সুতরাং ইস্রাইলী কায়দায় পাকিস্তানের প্রথম আঘাত ব্যর্থ। তার সমর নায়করা জানতেন—ভারতের বিরুদ্ধে

সর্বাত্মক লড়াই-এর সূচনার অর্থ পাক কবল থেকে বাংলাদেশের মুক্তি এবং সেখানে স্বাধীন সরকারের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা। ইয়াহিয়া নাকি গর্ব করে বলতেন—হৃত বাংলাদেশ তিনি পুনরুদ্ধার করবেন দিল্লীতে। তবে একথা সত্য যে, অতর্কিত বিমান হানার এতবড় অসাফল্য তিনি কল্পনাও করতে পারেন নি। বাংলাদেশের অভাব কাশ্মীর দিয়ে পুরিয়ে নেওয়া অসম্ভব। যুদ্ধ-বিরতি সীমারেখার আশে-পাশে চলছে প্রচণ্ড লড়াই। ভারতীয় বাধা দুরতিক্রম্য।

বাংলাদেশ হাতছাড়া হবে এবং পশ্চিমের লড়াই চলবে পাকিস্তানের সামনে এ সম্ভাবনা এখন খুবই স্পষ্ট। বৃটেন এবং আমেরিকা ঘাপটি মেরে বসেছিল। দেখছিল শুধু ইসলামাবাদের অতর্কিত আক্রমণের ফলাফল। যদি মাটিতেই ভারতীয় বিমান বহরকে ধ্বংস করতে পারত পাকিস্তান তবে ওরা সহজে মুখ খুলত না। স্বস্তি পরিষদে কেউ হৈচৈ করতে গেলে বাধা দিত। কালহরণ হত তাদের অনুসৃত কৌশল। এই কৌশল প্রয়োগ করেছিল তারা ১৯৬৭ সালের আরব-ইস্রাইল লড়াই-এর সময়। বিজয়ী ইস্রাইলী বাহিনীকে আরবভূমি দখলের পর্যাপ্ত সুযোগ দানই ছিল তাদের মৌল উদ্দেশ্য। পাকিস্তানী বাহিনীও যদি পশ্চিম রণাঙ্গনে তাড়তাড়ি এগুতে পারত তবে অন্তত আগামী ক' দিনের মধ্যে শান্তির মাথা ব্যথা থাকত না বৃটেন এবং আমেরিকার। কিন্তু যুদ্ধের হাল যাচ্ছে বদলে। বাংলাদেশে পাক প্রতিরোধ ভেঙ্গে পড়ার বেশী দাবী নেই। সেখানে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের প্রতিষ্ঠা অবধারিত। বাংলাদেশে ঢুকে পড়েছে ভারতীয় সৈন্যদল। মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে একযোগে তারা চালাচ্ছে পাক ঘাঁটিগুলোর উপর আক্রমণ। পাকিস্তান নিজেই ভারত আক্রমণ করে মুক্তিবাহিনীর লড়াই তুলে দিয়েছে ভারতীয় জওয়ানদের হাতে। ওদিকে পশ্চিম রণাঙ্গণে তার দ্রুত সাফল্যের আশা নেই বললেই চলে। সুপরিকল্পিত প্রথম আঘাত ব্যর্থ এবং ভারতের পাল্টা আঘাত মারাত্মক। তবু এখানে হয়ত লড়াই হবে

দীর্ঘস্থায়ী। হয়ত তার গতি চলবে ১৯৬৫ সালের লড়াই-এর তালে। তাতে জিতবে ভারত। ভেঙ্গে পড়বে পাক সামরিক শক্তির আসল বনিয়াদ। যুদ্ধে খোয়ান অস্ত্রের পরিপূরণ পাকিস্তানের সাধ্যাতীত। কিন্তু ভারত নিজেই অস্ত্র নির্মাতা। দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের শক্তি সে রাখে। এ অবস্থায় পাকিস্তানকে লক্ষ্য করবে কে? আছে বৃটেন এবং আমেরিকা। ইতিমধ্যে তারা ডেকেছে স্বস্তি পরিষদের বৈঠক। এই বৈঠকের মূল লক্ষ্য যুদ্ধ-বিরতি এবং পূর্ব ও পশ্চিম সীমান্ত বরাবর রাষ্ট্রসংঘেব পর্যবেক্ষক বাহিনী মোতায়েনের ব্যবস্থা। এ ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করেছে সোভিয়েত রাশিয়া। স্বস্তি পরিষদের প্রস্তাবে সে দিয়েছে ভিটো।

পিকিং-এর মতিগতি বদলায় নি। তার ভারত-বিদ্বেষী সুর চড়া পর্দায় বাধা। প্রচার এবং অন্যের জন্য বন্দুক ধরার মধ্যে পার্থক্য অনেক। ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত লড়াইর এক সঙ্কট মুহূর্তে পিছন থেকে ভারত আক্রমণের হুমকী দিয়েছিল চীন। এবারের অবস্থা আলাদা। সোভিয়েট রাশিয়া দাঁড়িয়ে আছে ভারতের পিছনে। কোন হঠকারিতার আগে অবশ্যই সাত-পাঁচ ভাববে চীন। মনে হয়, যুদ্ধ যতদিন চলবে ততদিন সে তর্জন গর্জন করবে। পাকিস্তানকে অস্ত্র সাহায্য দেবে। আর সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করে ভারতীয় বাহিনীর একটা বড় অংশকে আটকিয়ে রাখবে। বৃটেন এবং আমেরিকার আচরণ হবে ১৯৬৫ সালের মতই। পাকিস্তানকে প্রত্যক্ষ সাহায্য দিতে তারা এগুবে না। পিছনে করবে ষড়যন্ত্র। এদের হাতিয়ার ইরাণ, সৌদী আরব এবং তুরস্ক। ওদের মাধ্যমে হয়ত পাঠাবে সমর সম্ভার। চরম সামরিক বিপর্যয়ের মধ্যে এসে পড়ে যদি পাকিস্তান তবে হয়ত গোপনে দেওয়া হবে বিমান ছত্র। এর নজিরও আছে সাম্প্রতিক ইতিহাসে। অবশ্য তা ঘটেছে অন্য পরিপ্রেক্ষিতে। ১৯৫৬ সালে মিশরের উপর সর্বাত্মক বিমান আক্রমণ চালিয়েছিল ইস্রাইল। তার সব কটি বিমানই ব্যবহার করেছিল এই

অভিযানে। তার নিজের আকাশে বিমান ছত্র ধরেছিল ফ্রান্স। তারপর বৃটেন এবং ফ্রান্স একযোগে করেছিল সুয়েজ আক্রমণ। আরবদের সন্দেহ, ১৯৬৭ সালের লড়াই-এ আরব বিমান ঘাঁটিগুলোর উপর ইস্রাইলী বিমান বহরের ব্যাপক এবং অতর্কিত বিমান হানার সময় ইস্রাইলের আকাশ রক্ষার ভার নিয়েছিল মার্কিন বিমান এবং মার্কিন পাইলটরা। এ সব অভিযোগের সত্যাসত্য প্রমাণ কঠিন। তবে সন্দেহ একেবারে অমূলক নাও হতে পারে। পাকিস্তানী আকাশে এ ধরণের ব্যবস্থা থাকলে কিম্বা ভবিষ্যতে গড়ে উঠলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। পশ্চিম রণাঙ্গণে যুদ্ধের গতি যে পথেই চলুক না কেন বাংলাদেশের লড়াই তাড়াতাড়ি শেষ করা খুবই দরকার। সেখানে স্বাধীন সরকারের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা যত বিলম্বিত হবে রাষ্ট্রসংঘের মাধ্যমে তালগোল পাকানোর ষড়যন্ত্র তত দানা বেধে উঠবে। এ সুযোগ কখনই দেওয়া যেতে পারে না পাক দোস্তদের।

মুক্তিযুদ্ধ নিছক দুর্গদখলের লড়াই নয়

আবদুল গাফফার চৌধুরী

খবরের কাগজের পাঠক মাত্রেই যুদ্ধের খবরে অলৌকিক ও চকমপ্রদ কিছু প্রত্যাশা করেন। রণাঙ্গন থেকে নিরাপদ দূরত্বে বসে প্রত্যহ শত্রুঘাঁটির পতন-সংবাদ শোনা নিঃসন্দেহে রোমাঞ্চকর। তখন যুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধের পার্থক্য খবরের পাঠকমাত্রই ভুলে যান। কোন যুদ্ধের পেছনে সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক লক্ষ্য থাকতে পারে, নাও থাকতে পারে। যেমন বাংলাদেশে পাকিস্তানী হানাদারেরা লড়ছে সামরিক বিজয়ের জন্য, রাজনৈতিক জয়ের জন্য নয়। বাংলাদেশের মানুষকে কোন সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক লক্ষ্য বা আদর্শ দ্বারা তারা অনুপ্রাণিত করতে পারেনি। অন্যদিকে মুক্তিবাহিনীর লড়াই চমকপ্রদ সামরিক বিজয়ের জন্য নয়, সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য। এই লক্ষ্য জাতীয় স্বাধীনতা। এই রাজনৈতিক প্রেরণাই মুক্তিবাহিনীর সবচাইতে বড় হাতিয়ার। অই শত্রুসৈন্য সংখ্যায় অনেক বেশী, অনেক বেশী সশস্ত্র এবং সংগঠিত হওয়া সত্ত্বেও ব্যাপক জন-সমর্থনের বলে বলীয়ান মুক্তিবাহিনী চূড়ান্ত জয়ে আশাবাদী। যশোর সেক্টরে মুক্তিবাহিনীর এক তরুণ অফিসার আমাকে বলেছেন, আপনারা যাঁরা খবরের কাগজে লেখেন তাঁদের উচিত পাঠকদের বোঝানো, আমরা বিস্ময় বা চমক সৃষ্টির জন্য লড়ছি না। লড়ছি স্বাধীনতার জন্য। আমাদের অস্ত্রবল, লোকবল ও অন্যান্য সীমাবদ্ধতা আপনাদের মনে রাখতে হবে। ভিয়েতনামে লোকক্ষয় ও শক্তিক্ষয় এড়ানোর জন্য ভিয়েতকংদের টেট অফেনসিভের কথা আপনাদের মনে আছে। সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং চীন থেকে

প্রচুর অস্ত্র সাহায্য পাওয়া সত্বেও শুধু নিজেদের ভিয়েৎকংরা এই মারকিনী ঘাঁটিটি তিন মাস অবরোধ করে রেখেছিল। দখল করতে এগোয়নি। প্রশ্ন করলাম, আপনারাও কি যশোর ক্যানটনমেণ্ট অবরোধ করতে চান? তরুণ অফিসার হেসে বললেন, চাই কি বলছেন, অবরোধ তো করেই ফেলেছি। কেবল আমাদের শক্তিক্ষয় ও লোকক্ষয় এড়ানোর জন্য দুর্গটি সহসা দখল করছি না। কিন্তু চারদিক থেকে তার সরবরাহ লাইন আমরা কেটে দিচ্ছি। সুতরাং সাতদিন, না সাত সপ্তাহ—কতদিন শত্রুপক্ষের মর‍্যাল অক্ষুণ্ণ থাকে, তার উপরই নির্ভর করছে দুর্গদখলের সঠিক দিনক্ষণ। বললাম, আগে তাহলে যশোর দুর্গ মুক্ত হচ্ছে? তিনি বললেন, তা বলতে পারবো না। শত্রুপক্ষের কয়েকটি সুরক্ষিত ক্যানটনমেনটের মধ্যে আগে কোনটি আমরা দখল করতে চাই সে সম্পর্কে তাদের মধ্যে বাধা সৃষ্টিই আমাদের রণকৌশল। তবে আমরা চাই যে দুর্গটিরই আগে পতন ঘটুক, তা যেন হয় ভিয়েতনামে ফরাসীদের জন্য দিয়েন-বিয়েন ফুর ঘাঁটির পতনের মত। ওই একটি সুরক্ষিত ঘাঁটির পতনের পরই ভিয়েতনামে ফরাসী সৈন্যদের মনোবল ভেঙে গিয়েছিল। তারা লড়াই না চালিয়ে পাততাড়ি গুটিয়েছিল। বাংলাদেশেও শত্রুপক্ষের এমন একটি সুরক্ষিত সামরিক ছাউনি আমরা আগে দখল করতে চাই যে ছাউনির পতনের ফলে, তাদের মনোবল ভেঙে যাবে এবং অন্য ছাউনিগুলোতে প্রতিরোধ ও আত্ম-রক্ষার চেষ্টা না করেই তারা পাততাড়ি গুটাবে। তাতে আরও চার কি পাঁচটি সামরিক ছাউনি দখলের লোকক্ষয় ও শক্তিক্ষয় আমরা এড়াতে পারবো এবং অন্যদিকে আমাদের উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হবে। তাই চমকপ্রদ ও তড়িৎ বিস্ময় লাভের নীতি গ্রহণ না করে আমরা ধীর অথচ অব্যাহত আঘাত ও চাপ সৃষ্টি দ্বারা শত্রুর মনোবল ও স্নায়ু নিস্তেজ করে দেওয়ার নীতি গ্রহণ করেছি।

বাংলাদেশের মানচিত্রটা সামনে রাখুন। তাহলেই মুক্তিযুদ্ধের

একটা সমগ্র চিত্র আপনার চোখে ভাসবে। নভেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে নতুন উদ্যমে যে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছে, তার ফ্রন্ট একটি নয়, অনেক। তবে লক্ষ্যস্থল একটি—ঢাকা। এই ঢাকাকে কেন্দ্র করে উত্তরে যুদ্ধ চলছে দিনাজপুর ও রংপুরে, পশ্চিমে রাজশাহী, কুষ্টিয়ায়, পশ্চিম-দক্ষিণে যশোর, খুলনায় এবং পূর্বে সিলেট, কুমিল্লা, নোয়াখালী ও চট্টগ্রামে। মুক্তিবাহিনী শুধু বিস্তীর্ণ এলাকা ও শত্রুঘাঁটি দখল করেনি, তারা পাকিস্তান বাহিনীর মূল ছাউনিগুলোর যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রায় বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। যেমন যশোর-মাগুরা সড়ক এখন বিচ্ছিন্ন। ফেণীর কাছে কুমিল্লা-চট্টগ্রাম সড়কের একটা বড় অংশ মুক্তি বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে। হিলিতে নাটোর-ঢাকা যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। সিলেট-কুমিল্লা সড়কও প্রায় বিচ্ছিন্ন। ফলে একযোগে বিপন্ন হয়ে পড়েছে ময়নামতী, কুমিল্লা যশোর ক্যান্টনমেণ্ট। এসব ছাউনির পাকিস্তানী সৈন্যদের অবস্থাও প্রায় অবরুদ্ধ। পাকিস্তানী সৈন্য অবরোধ ভেঙে মুক্তিবাহিনীর অধিকৃত এলাকা, অগ্রবর্তী ঘাঁটি বা ভারত-সীমান্তের দিকে এগুবে, তাও পারছে না। কারণ, মুক্তি-বাহিনীর সশস্ত্র গেরিলা-ইউনিট রয়েছে তাদের পেছনে, ডানে ও বামে। সংখ্যায় তারা হাজার হাজার এবং তাদের গোপন অবস্থান রাজধানী ঢাকা পর্যন্ত বিস্তৃত। গেরিলা ইউনিটের এক অফিসার আমাকে বলেছেন, আমরা এখন যে নীতি অনুসরণ করছি, তা হচ্ছে কোরিয়া-মানচুরিয়া সীমান্তে ম্যাকয়ারথার বাহিনীর বিরুদ্ধে চীনা সৈন্যদের অনুসৃত নীতি। ম্যাকআরথার তার বাহিনীকে বলেছিলেন, মানচুরিয়া সীমান্ত পর্যন্ত চীন সৈন্যদের তাড়িয়ে ও পরাস্ত করে দেশে ফিরে তারা বড়দিনের পিঠা খাবেন। কিন্তু এই পিঠা খাওয়া তাদের ভাগ্যে ঘটেনি। চীনা সৈন্যেরা মারকিনী সৈন্যের আক্রমণের মুখে দ্রুত পশ্চাদপসরণ করেছে, কিন্তু পেছনে, ডানে, বামে অসংখ্য গোপন গেরিলা পকেট রেখে গেছে। পরবর্তী পর্যায়ে প্রচণ্ড পালটা আক্রমণ এবং পেছনে, ডানে, বামে গেরিলাদের ধ্বংসাত্মক তৎপরতায় মারকিন

সৈন্য রণক্ষেত্রে তিষ্ঠোতে পারেনি। গত আট মাসে বাংলাদেশের যুদ্ধে মুক্তিবাহিনী দেশের সর্বত্র অসংখ্য গেরিলা-পকেট তৈরী করেছেন। এখন সামনে থেকে মুক্তিবাহিনীর পাল্টা আক্রমণ এবং চারদিকে গেরিলা-ইউনিটের তৎপরতায় পাকিস্তানী সৈন্যেরা অতিষ্ঠ। নয়াচীন থেকে তাদের কয়েকটি গেরিলা তৎপরতা-বিরোধী ইউনিট শিক্ষাগ্রহণ করে ফিরেছে। কিন্তু জন-সমর্থনের অভাবে তাদের শিক্ষা কোন কাজে লাগছে না। প্রথমদিকে পাকিস্তানী সৈন্যরা ভেবেছিল, তারা মার্চ মাসের মত সামরিক ছাউনিতে ঢুকে শক্তি সংহত করে প্রবল পাল্টা আক্রমণ চালাবে। কিন্তু এখন তারা দেখছে, গোটা বাংলাদেশের জনগণ তাদের বিরুদ্ধে। চারদিকে ক্রুদ্ধ ও আঘাতহানার জন্য অপেক্ষামান সাধারণ মানুষ এবং গেরিলা ইউনিট দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে মুখোমুখি লড়াইয়ে নামতেও তারা ভয় পাচ্ছে। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে কোন নতুন সরবরাহ আসছে না। বাংলাদেশেও পাকিস্তানী ঘাঁটিগুলোর অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিন্ন। এই অবস্থায় তারা একটিমাত্র আশাতেই দিন গুনছে আর সামরিক ছাউনির সুরক্ষিত বিবরে ঢুকে কালহরণের নীতি গ্রহণ করেছে তা হল, বৃহৎ শক্তিবর্গের চাপে যদি মুক্তিবাহিনী তৎপরতা হ্রাস পায় কিংবা কোন তথাকথিত রাজনৈতিক আপসের কাঠামাতে তারা বাংলাদেশ থেকে যাওয়ার সুযোগ পায়।

কিন্তু মুক্তিবাহিনীর তরুণ অফিসারদের ধারণা, এ সুযোগ তারা পাবে না। মুক্ত এলাকার যেখানেই তাঁরা যাচ্ছেন, সেখানেই জনগণের কাছ থেকে সাগ্রহ ও স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যর্থনা লাভ করে তাঁদের নিশ্চিত ধারণা হয়েছে, বাংলাদেশের সর্বস্তরের মানুষের বিরোধিতার মুখে এক পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যে সমস্যার আর কোন সমাধান সম্ভব নয়। কোন কোন বৃহৎ শক্তি তা চাইতে পারেন, কিন্তু তা চাপিয়ে দিতে পারবেন না। মুক্তিবাহিনীর এক তরুণ অফিসার আমাকে বলেছেন, পাকিস্তানী সৈন্যেরা যে হারে বাংলাদেশে

অত্যাচার নারীনিগ্রহ ধ্বংস ও লুণ্ঠন চালিয়েছে, তাতে তাদের সঙ্গে আবার এক রাজনৈতিক কাঠামোতে মিলিত হওয়া দূরে থাক, আগামী একশো বছর যদি কোন বাঙালী পশ্চিম পাকিস্তানীদের মুখদর্শন করতে না চায়, আমি বিস্মিত হব না। ইহুদীরা পঁচিশ বছরেও এক আইখম্যানকে ভোলেনি। বাঙালীরা ইয়াহিয়াকে ভুলবে, আপনি কি তা ভেবেছেন?

আমেরিকা কি রাশিয়ার হুঁশিয়ারি লংঘন করবে

রণজিৎ রায়

গত আট মাস ধরে প্রচণ্ড রাজনীতিক চাপ ঠেকিয়ে রাখার পর অবশেষে শ্রীমতী গান্ধী বাংলাদেশের গণ প্রজাতন্ত্রী সরকারকে কূট-নীতিক স্বীকৃতি দিয়েছেন। অন্য কোন দেশ অবিলম্বে ঐ সবকারকে স্বীকৃতি দিক বা না দিক, জন্মের রজত জয়ন্তী বর্ষে পাকিস্তান যে আজ সম্পূর্ণ দ্বিধাবিভক্ত তাতে আর সংশয়ের অবকাশ নেই। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ প্রভুদের কূট কৌশলে পাকিস্তান নামধেয় যে দৈত্যাকার বস্তুটিব জন্ম; আমেরিকার রাজনীতিক এবং অর্থনীতিক সাহায্যের কোলে বসে যার বৃদ্ধি, সেই ভৌগোলিক ও রাজনীতিক বস্তুটির পুরাণো পরিচয় এখন ইতিহাসেব বিষয়।

বাংলাদেশ থেকে পাক সেনাদের পুরোপুরি হটিয়ে দিয়ে সমগ্র বাংলাদেশের দায়িত্ব গ্রহণে ভারতীয় বাহিনী এবং মুক্তি বাহিনীর আরো কিছুদিন সময় হয়ত লাগবে। কিন্তু সার্বভৌম বাংলাদেশ নামক সত্য বস্তুটিকে আর অস্বীকার করা চলবে না। বাংলাদেশের অস্তিত্ব এখন ভারতের অস্তিত্বের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা। কোন শক্তি বা শক্তিগোষ্ঠী যাতে এই প্রতিষ্ঠিত সত্যকে বানচাল করে দিতে না পারে ভারত সেদিকে লক্ষ্য রাখবে। তাছাড়া, সার্বভৌম স্বাধীন দেশ হিসাবে বাংলাদেশের উজ্জ্বল অভ্যুদয়ের পর খোদ পশ্চিম পাকিস্তানেও অনেকে স্বাধীনতা পাওয়ার জন্য চেষ্টা শুরু করবে।

পাকিস্তানের দুই অংশ চিরকাল এক দেশ হিসাবে থাকতে পারত না। দুই অংশের মধ্যে পার্থক্যগুলি যে একেবারে মৌলিক। পশ্চিম পাকিস্তানীর নিজেদের পূর্ব পাকিস্তান রূপ উপনিবেশের নতুন প্রভু

বলে মনে করে অবস্থা আরো খারাপ করে তুলেছিল। জেনারেল ইয়াহিয়া এবং ওয়াশিংটনস্থিত তার মাষ্টারমশাই শ্রীনিকসনের চালে এতটা ভুল না হলে ভারত যেভাবে বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দিল তা সে ভাবে হয়ত হতনা। আওয়ামি লীগের সঙ্গে বোঝাপড়ায় এলে জেনারেল ইয়াহিয়া অন্তত আরো কয়েক বছরের জন্য পাকিস্তানের দুই অংশকে এক দেশ হিসাবে টিকিয়ে রাখতে পারতেন।

কিন্তু সুযোগ হাতে পেয়েও ইসলামাদেব ক্ষমতা-লোভী জঙ্গীচক্র সেই সুযোগকে কাজে লাগাতে পারল না। প্রধানমন্ত্রীর পদের জন্য যার অনেকদিন থবেই লালা ঝরছে সেই ভুট্টোর কু পরামর্শে ভুলে ইয়াহিয়া পাকিস্তানের একমাত্র খাঁটি নির্বাচনের ফল পায়ে মাড়িয়ে গেলেন; চরম ধূর্ততায় ২৫ মার্চ থেকে বাঙালী নিধন ও বাঙালী জাতিকে মুছে দেওয়ার জন্য জল্লাদ বৃত্তি শুরু করে দিলেন। ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে তিনি তাব বোকামিব মাত্রা আবো বাড়িয়ে তুলেছেন মাত্র। যুদ্ধের জবাবে যুদ্ধ কবা ছাড়া শ্রীমতী গান্ধীর সামনে দ্বিতীয় পথ খোলা ছিল না। বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান সেই যুদ্ধেরই অঙ্গ।

১৯৬৯ সালে পাকিস্তানের দুই অংশে প্রবল গণ বিক্ষোভের কাছে নতি স্বীকার করে ফিলড মারশাল আয়ুব খান বিদায় নেন। তার জায়গায় আসেন আর এক জঙ্গী শাসক—তিনি জেনাবেল ইয়াহিয়া। শুরুটা ইয়াহিয়া ভালোই করেছিলেন। গাল ভরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন: তিনি গণতন্ত্রের পুনরুজ্জীবনই চান। অনেক টালবাহনার পর যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল তাতে বাঙালীদের ভোট দেবার ধরণে তিনি ঘাবড়ে গেলেন, নিজের সৈন্যদের লেলিয়ে দিলেন নিরস্ত্র বাঙালীদের উপর। ইয়াহিয়া বোধহয় ভেবেছিলেন যে তিনি যখন সব ব্যাপারে ভুট্টো সাহেবের কথা মেনে চলেন তখন সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তান তার পেছনে থাকবেই সুতরাং তিনি অনায়াসেই "ভীতু" বাঙালীদের গুড়িয়ে দিতে পারবেন। পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের

সামনে পড়লেই বাঙালীরা আত্মসমর্পণ করবে বলে তিনি আশা করেছিলেন। কিন্তু কী ভুল হিসেবই না ইয়াহিয়া করেছিলেন।

গত ডিসেম্বরে পাকিস্তানে নির্বাচনের পর থেকে ভারতের মনোভাবে মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছে। নির্বাচনের ফল প্রকাশের পরও বাংলাদেশ স্বশাসিত পৃথক ইউনিট হয়ে দাঁড়ালে ভারতের উপর তার ফল কী হতে পারে সে সম্পর্কে নয়াদিল্লি সুনিশ্চিত হতে পারছিলনা। ২৫ মার্চের পরও ঐ সংশয় বজায় ছিল। কিন্তু লক্ষ লক্ষ শরণার্থী ভারতে প্রবেশ করতে শুরু করার পর থেকে অবস্থা পালটে গেল। বাংলাদেশের মানুষের—বিশেষ করে তরুণদের তীব্র প্রতিশোধ স্পৃহা স্পষ্টই বুঝিয়ে দিল যে পাকিস্তানের দুই অংশের এক দেশ হিসাবে থাকার দিন শেষ হয়ে এসেছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারত ক্রমশই বেশি করে জড়িয়ে পড়তে লাগল। ভারত সরকারের এক মুখপাত্রের ভাষায়ঃ "আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ভারতের সংগ্রাম বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের সঙ্গে মিলে-মিশে এক হয়ে গিয়েছে।"

জেনারেল ইয়াহিয়া যাতে যুক্তির পথ ধরেন এবং শেখ মুজিবর রহমান ও আওয়ামি লিগের সঙ্গে রাজনীতিক বোঝাপড়ায় আসেন —তার জন্য তার উপর চাপ সৃষ্টি করতে আমাদের প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যান্য কূটনীতিকরা গত চার মাস ধরে বিশ্বের নানা দেশের কাছে বহুবার আবেদন করেছেন। চারটি দেশ—সোভিয়েত ইউনিয়ন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, চীন এবং ব্রিটেনের উপরেই এ ব্যাপারে ভারত বেশি গুরুত্ব দিয়েছিল।

আমেরিকার আচরণ বরাবরই আমাদের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। সে পাকিস্তানী সামরিক যন্ত্রে বরাবর তেল মাখিয়ে আসছে। কূট-নীতিক ক্ষেত্রেও আমেরিকাই পাকিস্তানের বড়দার ভূমিকা নিয়েছে। আমেরিকার নির্দেশেই বেলজিয়াম এবং ইতালি পাক-ভারত যুদ্ধের উপর ভারত-বিরোধী প্রস্তাব পেশ করেছিল। আমেরিকার হাবভাবে

মনে হচ্ছে যে ভারতের বিরুদ্ধে সরাসরি সামরিক হুমকি দিতে চায়। প্রভূত ক্ষমতাশালী আমেরিকার নৌবহরের অনেকগুলি যুদ্ধ জাহাজ মালাক্কা প্রণালী হয়ে প্রশান্ত মহাসাগর থেকে ভারত মহাসাগরের দিকে অগ্রসর হচ্ছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় বিমানগুলি একখানা মারকিন বাণিজ্য জাহাজে গোলা ছুড়েছে বলে অভিযোগ করে ওয়াশিংটন থেকে প্রতিবাদ জানানো হচ্ছে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্রিটেন অবশ্য আমেরিকার মত প্রকাশ্যে ভারতের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক ভঙ্গি গ্রহণ করেনি। সবচেয়ে অদ্ভুত হল চীনের আচরণ। পাক-ভারত যুদ্ধ এড়ানো যাবে না এটা মোটামুটি স্পষ্ট হয়ে ওঠার পরেই হয়ত নয়াদিল্লি পিকিং-এর সঙ্গে যোগ স্থাপনের জন্য সচেষ্ট হয়েছে। পাকিস্তান টুকরো টুকরো হয়ে পড়লে এই অঞ্চলে ভারতই অপ্রতিহত শক্তি হয়ে দাঁড়াবে—এ ধারণাও হয়ত ঠিক। কিন্তু এর দ্বারা ঔপনিবেশিকতার নাগপাশ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য বাংলাদেশের যুদ্ধের মহানেতাকে অস্বীকার করে চলে না। বাংলাদেশের ব্যাপারে পিকিং সবাসবি পাক জঙ্গীচক্রের পক্ষ নিয়েছে। অথচ এই পিকিং-ই দাবি করে থাকে যে সোভিয়েত ইউনিয়ন উৎকট সমাজতান্ত্রিক স্বাদেশিকতাবাদী হয়ে পড়ার পর ঔপনিবেশিকতা ও নয়া ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে গণ-সংগ্রামের নেতৃত্ব দেবার দায়িত্ব চীনকেই তুলে নিতে হয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর এশিয়ায় আমেরিকার ভূমিকা বরাবরই একই চেহারা নিচ্ছে। ঐ দেশ সব সময়ই তলিয়ে যাওয়া পক্ষকেই সমর্থন করে। আমেরিকা এশিয়ার নানা দেশে স্বৈর শাসক কিংবা হবু স্বৈরতন্ত্রী নেতাকে মাথায় বসিয়ে ক্রীড়ানক সরকার গড়ার চেষ্টা করেছে ফলে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আমেরিকা সাধারণ মানুষের কাছ থেকে তীব্র ঘৃণা কুড়াতে বাধ্য হয়েছে। আমেরিকা বাংলাদেশের ব্যাপারে তার পুরানো ইতিহাসকেই পুনরাবৃত্ত করছে। কিন্তু পিকিং ভারতকে নাস্তানাবুদ করার জন্যই আমেরিকার পথ ধরেছে। ভারত

সরকার অবশ্য এখানো আশা করেন যে ইসলামাবাদকে কূটনীতিক সমর্থন এবং অস্ত্রাদি দেবার ব্যাপারে পিকিং আর বেশি দূর এগুবে না।

সোভিয়েত ইউনিয়নই একমাত্র বৃহৎ শক্তি যে ভারতের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। আজ স্বতন্ত্র দলের মত উগ্র মারকিন-পন্থী দলও সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকার প্রশংসা করছে। গত ২৫ মার্চের পর থেকে এই উপমহাদেশের ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে সম্পাদিত শান্তি-মৈত্রী চুক্তিটিই ভারতের সবচেয়ে বেশি দৃষ্টিগোচর কূটনীতিক সাফল্যের চিহ্ন বহন করছে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন আমাদের আধুনিক অস্ত্র তৈরির পক্ষে প্রয়োজনীয় যে সব শিল্প গড়ে তুলতে আর্থিক ও কারিগরি সাহায্য দিয়েছে সেগুলির গুরুত্ব অত্যন্ত স্পষ্ট। এ ছাড়াও সোভিয়েত ইউনিয়ন আমাদের প্রচুর পরিমাণ সমর সম্ভার দিয়েছে। আমাদের জওয়ানরা সেগুলির সদ্ব্যবহারই করছেন।

গত কয়েক মাস ধরে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতকে যে কূট-নীতিক সমর্থন দিয়েছে তার কথা ভারত সরকার প্রকাশ্যেই স্বীকার করে থাকেন। নিরাপত্তা পরিষদে সেই পাকিস্তানের সমর্থকদের কোণঠাসা করে ফেলেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নই একমাত্র দেশ যে বরাবর প্রকাশ্যে বলে আসছে যে বাংলাদেশের সমস্যার নিরসনের একমাত্র উপায় রাজনীতিক সমাধান সন্ধান।

তিন দিন আগে মস্কো যে বিবৃতি দিয়েছে তার গভীর তাৎপর্য কারো চোখ এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়। কোন দেশের নাম করা হয়নি বটে; কিন্তু ঐ বিবৃতিতে ভারত উপমহাদেশে হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে মস্কো বৃহৎ শক্তিগুলির বিরুদ্ধে যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছে আমেরিকা এবং চীনই তার লক্ষ্য। মস্কো আরো এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বলেছে : এই উপমহাদেশে কী ঘটছে বা না ঘটছে তার সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িত। মারকিন সপ্তম

নৌ বহর ভারত মহাসাগরের দিকে আসছে এ সংবাদ সত্য হলেও নয়াদিল্লি আশা করছে যে ওয়াশিংটন মস্কোর হুঁশিয়ারিতে নিশ্চয়ই কান দেবে এবং তদনুযায়ী বঙ্গোপসাগর কিংবা অন্যত্র ভারতীয় নৌ বাহিনীর কাজে বাধা দেবে না। কারণ, সোভিয়েত হুঁশিয়ারির একটাই অর্থ হতে পারে: তা হল বিশ্ব-যুদ্ধ।

কেন ভারত ঠিক এই মুহূর্তে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিল?

বরুণ রায়

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী গত ২৬শে জুলাই যখন বাংলাদেশের ব্যাপার নিয়ে সংসদের বিরোধী দলের নেতাদের নিয়ে বৈঠকে মিলিত হন, তখন তাঁরা একবাক্যে বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারকে স্বীকৃতি দেবার জন্যে তাঁকে পরামর্শ দিয়েছিলেন।

তার উত্তরে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, স্বীকৃতির প্রশ্নে ভারত সরকার তাঁদের মন খোলা রেখেছেন। যে মুহূর্তে বোঝা যাবে স্বীকৃতি দিলে বাংলাদেশের স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের জাতীয় স্বার্থেরও সাহায্য হবে, সেই মুহূর্তেই বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হবে।

সেই বিশেষ মুহূর্ত হঠাৎ এই সময় কেন দেখা দিল? ভারত সরকার তাঁদের সিদ্ধান্তের জন্যে ডিসেম্বরের ছয় তারিখটিকে কেন বেছে নিলেন? এই সিদ্ধান্ত কেন আরও আগে নেওয়া হলো না, বিশেষত যখন স্বীকৃতি দেবার পক্ষে একাধিক সুযোগ নয়াদিল্লীর সামনে হাজির হয়েছিল, এবং যখন স্বীকৃতি দেবার জন্যে দেশের মানুষ দীর্ঘকাল যাবত দাবী জানিয়ে আসছিল?

প্রথম সুযোগ এসেছিল গত মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহে, যখন পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের সর্বাত্মক আক্রমণের জবাবে বাংলাদেশ স্বাধীনতা ঘোষণা করে একটি অস্থায়ী সরকার গঠন করেছিল শেখ মুজিবর রহমানকে রাষ্ট্রপ্রধান ঘোষণা করে। ঐ সরকারের কোনো আনুষ্ঠানিক ক্যাবিনেট তখনও ছিল না, কিন্তু কার্যত গোটা বাংলাদেশ ছিল মুক্তি সংগ্রামীদের দখলে। নয়াদিল্লী ইচ্ছে করলে তারই ভিত্তিতে

স্বীকৃতি দিতে পারত। পিকিং সরকার আরও কম ভিত্তিতে কম্বোডিয়ার নরোদম সিহানুকের নির্বাচিত সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

কিন্তু ভারত ঐ প্রলোভন গ্রহণ করে নি।

দ্বিতীয়বার সুযোগ এসেছিল যখন গত ১৭ই এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তের কাছে বাংলাদেশের একটি গ্রামে অস্থায়ী সরকারের নেতৃবৃন্দ প্রকাশ্যে শপথ গ্রহণ করেন। ঐ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিশ্বের দেশগুলির কাছে স্বীকৃতির জন্যে আনুষ্ঠানিকভাবে আবেদন জানিয়েছিলেন এবং ঐ আবেদনের সূত্র ধরে ভারত সরকারের পক্ষে স্বীকৃতি দেওয়ায় কোনো বাধা ছিল না। কেন না তারই চারদিন আগে রায় বেরিলীতে এক সাংবাদিক বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, বাংলাদেশ সরকার যদি আবেদন জানান তাহলে স্বীকৃতির প্রশ্নটি বিবেচনা করা হবে।

কিন্তু তখনও ভারত কোনো সিদ্ধান্ত নেয়নি।

তৃতীয় একটা সুযোগ হাজির হয়েছিল গত ৯ই আগষ্ট ভারত ও সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে মৈত্রী ও পারস্পরিক সাহায্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পরে। ততদিনে এটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁ বাংলাদেশের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে কোনো মীমাংসা আলোচনায় বসতে রাজি নন। আর এটাও স্পষ্ট ছিল যে, ভারতের মনোভাব যথেষ্ট কঠিন হয়ে উঠেছে। চুক্তি স্বাক্ষরের অব্যবহিত পরেই স্বীকৃতির মাধ্যমে ঐ মনোভাব প্রকাশ পেলে অবাক হবার কিছু থাকত না।

কিন্তু নয়াদিল্লী তখনও লাফিয়ে পড়েনি।

এ ছাড়া জনমতের চাপের সুযোগ তো ছিলই। বাংলাদেশের সংগ্রামে সমবেদনা ও একাত্মবোধ প্রকাশ করে গত ৩১শে মার্চ সংসদে সর্ববাদীসম্মত প্রস্তাব গৃহীত হবার পর থেকে-গণ-অভিমতের সবগুলি মাধ্যম থেকে স্বীকৃতি দেবার জন্যে সরকারের কাছে প্রবল দাবী জানানো হয়েছে। চাপ ছিল সংসদের শ্রীমতী গান্ধীর নিজের দলের,

হুয়েকটি ছাড়া সমস্ত রাজনৈতিকদলের, বিভিন্ন রাজ্য বিধানসভার, সংবাদপত্রের। জয়প্রকাশ নারায়ণ, আচার্য বিনোবা ভাবের ও এম সি চাগলার মতো শ্রদ্ধেয়, বিচক্ষণ জননেতারাও ভারতকে সাহস সঞ্চয় করে বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দিতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। যদি প্রকৃত জাতীয় দাবী বলতে কোনো একটি বিষয় থেকে থাকত তবে তা ছিল বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবার দাবী। জনমতের এই প্রবল চাপের কাছে নতি স্বীকার করে নয়াদিল্লী এই দীর্ঘ আট মাসের মধ্যে আরো আগে যে-কোনো সময় স্বীকৃতি দিতে পারত।

কিন্তু দেয় নি।

এর কারণ কি? সাহসের অভাব? দ্বিধা? ঝুঁকি নেবার অনিচ্ছা? বৃহৎ শক্তির ভয়? স্বীকৃতির সমস্ত দাবীকেই ভারত সরকার এতবার এতভাবে এড়িয়ে গেছেন, এবং স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী যেভাবে স্বীকৃতির ব্যাপারে তাঁকে চাপ না দেবার জন্যে একাধিকবার অনুরোধ জানিয়েছেন যে, ভারতের বাংলাদেশ নীতি সম্পর্কে জনমনে এই প্রশ্নগুলি দেখা দিতে আরম্ভ করেছিল।

কিন্তু এর কোনোটাই সত্যি ছিল না, কেন না প্রধানমন্ত্রী একটা নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসরণ করে চলছিলেন, এবং এতগুলি কথায় না বললেও বিভিন্ন সময়ে তিনি এ সম্পর্কে যথেষ্ট ইঙ্গিতও করেছিলেন, যদিও সে সময় তার তাৎপর্য গরম কথার ভাপের আড়ালে হারিয়ে গিয়েছিল।

পাকিস্তানী সন্ত্রাসের ফলে এপ্রিল মাসে যখন বাংলাদেশ থেকে উদ্বাস্তুরা দলে দলে ভারতে আসতে আরম্ভ করল, সেই সময়েই শ্রীমতী গান্ধী ঘোষণা করেছিলেন উদ্বাস্তুরা ছ' মাসের মধ্যে দেশে ফিরে যেতে পারবে। ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্পর্কে কোনো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা না থাকলে নিছক অনিশ্চয়তার মধ্যে এই ধরণের কোনো ঘোষণা করা যায় না।

তারপর ৫ই জুলাই কংগ্রেস পার্লামেন্টারী সভায় বিক্ষুব্ধ সদস্যদের

কাছে প্রধানমন্ত্রী একটি তাৎপর্যময় উক্তি করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন : 'ভারত পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করেছে এই দোষটা আমরা নিজেদের ঘাড়ে নিতে চাই না।'

এই দুটি ঘোষণা যদি এক সঙ্গে পড়া যায় তাহলে এটাই স্পষ্ট হয় যে, বাংলাদেশের ব্যাপারে ভারত অপেক্ষা করে চলতে চায়, কিন্তু সেই অপেক্ষা অনির্দিষ্টকালেব জন্যে নয়।

সুতরাং মার্চের শেষ সপ্তাহেই স্বীকৃতি দেওয়া সম্ভব ছিল না, কেন না তাহলে এটাই সকলে ধবে নিত যে, ভারত পাকিস্তানকে দু টুকরো কববার জন্যে ব্যগ্র। স্বীকৃতি দেওয়া সম্ভব ছিল না এপ্রিল মাসেও, কেন না তখনও ব্যাপাবটা এতদূব গড়ায়নি যাতে এটা বলা যায় দুনিয়ার দুর্মুখেরা, বিশেষ করে পশ্চিমী বৃহৎ শক্তিগুলি, ভারতের বিরুদ্ধে দোষারোপ করার সুযোগ পাবে না।

ভাবত সবকারের এই অপেক্ষা কবার নীতি চমৎকাবভাবে তিন দিক দিয়ে ভারতের স্বার্থে কাজ করেছে।

প্রথমত, দুনিয়াব জনমতের কাছে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁ এবং তাঁব জাঙ্গীশাহীব রক্তাক্ত, প্রতিহিংসাপরায়ণ চেহারাটা ক্রমশ নগ্নতরভাবে উদ্ঘটিত হয়েছে। মার্চের পববর্তী মাসগুলিতে ইয়াহিয়ার দুনেবা বাংলাদেশে যে গণহত্যাব পরিচয় রেখেছে তার পরে রাষ্ট্রনায়কদেব মনোভাব যা-ই থাকুক, একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, ইয়াহিয়ার ভূমিকা সম্পর্কে বিশ্বের মানুষেব কোনো স্বপ্ন নেই।

দ্বিতীয়ত, এই নিপীড়নের ফলে উদ্বাস্তুরা ক্রমশ যত বেশি সংখ্যায় আসতে শুরু করেছে, দুনিয়ার বিবেকের ওপর চাপ ততই বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ভারত সরকার ততই নিজের ভূমিকা তৈরী করবার সুযোগ পেয়েছেন।

তৃতীয়ত, এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, ভারত পাকিস্তানকে ভেঙ্গে দু'টুকরো করবার জন্যে উদগ্রীব নয়, কারণ অতি বড় প্ররোচনা সত্ত্বেও সে ধৈর্য রক্ষা করে চলেছে।

কিন্তু যেহেতু ভারতের অপেক্ষা ছিল সীমাবদ্ধ সময়ের জন্মে, সেই কারণে নিছক অপেক্ষা করা ছাড়াও প্রধানমন্ত্রী আরও কিছু ব্যবস্থা ঠিক করে রাখছিলেন। একথা ঠিক যে, শ্রীমতী গান্ধী যখন ছ' মাসের মধ্যে উদ্বাস্তুদের ফিরিয়ে দেবার কথা বলেছিলেন তখন তিনি ভেবেছিলেন যে, এই সময়ের মধ্যে আন্তর্জাতিক রাজনীতি বাংলাদেশের ব্যাপারে একটা সন্তোষজনক সমাধানে পৌঁছতে পারবে। একটি রাজনৈতিক মীমাংসার ওপর তিনি যদি প্রকৃতই নির্ভর না করতেন তাহলে তিনি ছ'মাস অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিতেন না।

উদ্বাস্তুরা অবশ্য ছ'মাসের মধ্যে ফিরে যেতে পারেনি। তবে প্রধানমন্ত্রী তাঁর কথা রেখেছেন। রাজনৈতিক মীমাংসার জন্য তিনি ছ'মাস অপেক্ষা করেছেন। কিন্তু তার মধ্যেও যখন বৃহৎ শক্তিবর্গ মীমাংসায় আসতে ইয়াহিয়া খাঁকে বাধ্য করতে পারল না, তখন সুরু হলো ভারতের চাপ-সৃষ্টির পালা।

আর তখনই ভারতের সামনে গ্রহণযোগ্য সুযোগগুলি দ্রুত ফুরিয়ে আসতে লাগলো।

পশ্চিমী নিষ্ক্রিয়তার এবং পাকিস্তানী সামরিক তৎপরতাব জবাবে ভারত তার সীমান্তে সৈন্য মোতায়েন করতে আরম্ভ করল। এর দ্বারা ভারত বোঝাতে চেয়েছিল যে, সে কাজ বোঝে এবং কোনোরকম বেয়াড়াপনা মুখ বুঁজে সহ্য করবে না।

এটা ছিল এক নম্বর চাপ। তাতেও যখন বৃহৎ শক্তিগুলি নড়ে বসল না, তখন এলো দু'নম্বর চাপ—৯ আগষ্টের ভারত-সোভিয়েট চুক্তি। তবুও ভারত অপেক্ষা করে ছিল। আগষ্টের শেষে প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং পশ্চিমী রাজধানীগুলিতে গিয়েছিলেন এটা বোঝাবার জন্মে যে, ভারতের ধৈর্যের মেয়াদ ক্রমশ ফুরিয়ে আসছে, সুতরাং রাজনৈতিক মীমাংসার জন্মে যদি কিছু করতে হয় তাহলে অবিলম্বে করা হোক।

কিন্তু তার পরেও কোনো কূটনৈতিক তৎপরতা দেখা যায়নি।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিকসন হোয়াইট হাউসের ব্যাংকেট হলের তাৎপর্য বুঝিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে বিদায় দিয়েছিলেন।

কাজেই ভারতের পক্ষে আরেক ধাপ না এগিয়ে সম্ভব ছিল না। ভারত সরকার সীমান্তে পাকিস্তানী হামলার জবাবে সীমান্ত অতিক্রম করে পাকিস্তানীদের প্রতিহত করবার সিদ্ধান্ত নিলেন। উপমহাদেশের পরিস্থিতি আরও অবনত হলো।

কিন্তু প্রায় এক কোটি শরণার্থীর ভারে জর্জরিত ভারতের আবেদন বিশ্ব কূটনীতি তখনও সাড়া দিল না।

এর পর ভারতের সামনে প্রকৃতপক্ষে খোলা ছিল মাত্র দুটি পথ: এক, পাকিস্তানের সঙ্গে সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া; দুই বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দিয়ে বাংলাদেশের আরও অভ্যন্তরে গিয়ে পাকিস্তানীদের মোকাবিলা করার অধিকার অর্জন করা। কেন না সীমান্তের কাছাকাছি আবদ্ধ থাকলে ব্যাপারটা দীর্ঘস্থায়ী হবার সম্ভাবনা ছিল।

কিন্তু যেহেতু ভারত নিজে থেকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে চায় নি, সেই জন্যে এটা গত দশ পনেরো দিনে ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠছিল যে ভারত স্বীকৃতি দেবার জন্যেই প্রস্তুত হচ্ছে।

এমন সময়, গত ৩ ডিসেম্বর, পশ্চিম সীমান্তে ভারতভূমি আক্রমণ করে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া প্রধানমন্ত্রীর কাজ অনেকটা সহজ করে দিলেন। ভারতের পক্ষে আত্মরক্ষার্থে বাংলাদেশের ভেতরে যেতে আর কোনো বাধাই রইল না। স্বীকৃতি—যেটা এই সময় নাগাদই প্রত্যাশিত ছিল—আর ততটা জরুরী বিষয় রইল না এবং আর কয়েকদিন অপেক্ষা করলেও কোনো ক্ষতি ছিল না।

তা সত্ত্বেও যে ভারত একটি আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ চলার মধ্যেই বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দিলেন তার কারণ সম্ভবত দুটি: প্রথমত, নয়াদিল্লী কখনই এটা দেখাতে চায় না যে, ভারত বাংলাদেশ দখল করে অস্থায়ী সরকারকে সমর্পণ করছে। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশ

এখন পূর্ণ স্বাধীনতার এত কাছে উপস্থিত যে, বাংলাদেশ সরকারকে আর স্বীকৃতি না দেওয়া অর্থহীন।

আট মাস দেরীতে এলেও এই স্বীকৃতি বাংলাদেশ সরকারের স্বার্থের কোনো ক্ষতি করেনি। কিন্তু আট মাস দেরীতে এসেছে বলেই ভারতের জাতীয় স্বার্থ চমৎকারভাবে রক্ষিত হয়েছে। ভারত এখন শুধু বাংলাদেশের ব্যাপারে জোর দিয়ে কথা বলার অধিকারই অর্জন করল না, ভারতের সামরিক তৎপরতা সম্পর্কে বিশ্ব শক্তিবর্গের প্রতিক্রিয়াও মারমুখী হবার সুযোগ পেল না। ভারতের পক্ষে এটা বিরাট কূটনৈতিক সাফল্য।

আদর্শ নয়, স্বার্থ বাংলাদেশ প্রশ্নে চীনের এই ভুমিকা কেন

আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী

বাঙলাদেশ প্রশ্নে নয়াচীনের ভূমিকার একটি সাধারণ ব্যাখ্যা অনেকেই দিয়ে থাকেন। ব্যাখ্যাটি হল, এশিয়ায় ভারতের প্রভাব হ্রাস ও নিজের প্রতিপত্তি বৃদ্ধির স্বার্থে একেবারে ভারতের দুয়ারেই পাকিস্তানের মত একটি বৈরী রাষ্ট্র তার অবাস্তব ও অস্বাভাবিক অখণ্ডতা নিয়ে টিঁকে থাকুক—এবং শুধু টিঁকে থাকা নয়, ভারতকে সর্বক্ষণ যুদ্ধের হুমকির মুখে বিব্রত রেখে চীনকে নিরুদ্বেগে এশিয়ায় তার বাণিজ্যিক সাম্রাজ্য ও রাজনৈতিক মুরুব্বিয়ানা প্রতিষ্ঠার অব্যাহত সুযোগ দিক, এটাই পিকিংয়ের কর্তাদের আসল মতলব। চীনের আসল মতলবের এটা একটা সাধারণ ব্যাখ্যা। কিন্তু বাঙলা-দেশ প্রশ্নে নয়াচীনের বর্তমান ভূমিকা এবং সরাসরি সাড়ে সাত কোটি মানুষের মুক্তিযুদ্ধের প্রকাশ্য বিরোধিতার অন্তরালে কোন আদর্শ নয়, সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক লক্ষ্যের সঙ্গে একেবারেই সংকীর্ণ বাণিজ্যিক স্বার্থ কাজ করছে, এ সত্যটি বাঙলাদেশের বাইরে অনেকের কাছেই হয়ত স্পষ্ট নয়।

ত্রিশের জারমানীতে বাণিজ্যিক সম্প্রসারণের তাগিতে রাজনৈতিক প্রভুত্ব বিস্তারের জন্য নাৎসীবাদের অভ্যুদয়। প্রথম মহাযুদ্ধে পরাজিত ও বিধ্বস্ত জারমানী দ্রুত আত্মসম্প্রসারণের জন্য গণতন্ত্রের মুখোশ ফেলে দিয়ে নাৎসীবাদের আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। দীর্ঘকাল জাপানী আক্রমণ ও গৃহযুদ্ধে বিধ্বস্ত নয়াচীন কম্যুনিষ্ট শাসনপদ্ধতি গ্রহণ করার পরও এশিয়ার দ্রুত বাণিজ্যিক সম্প্রসারণ ও তার পূর্বশর্ত হিসাবে রাজনৈতিক প্রভুত্ব বিস্তারের জন্য ত্রিশের জারমানীর পথ অনুসরণ

করতে চাইবে কিনা, এটা চীন সম্পর্কিত পাশ্চাত্ত্য বিশেষজ্ঞদের অনেকের কাছেই একটা বহুদিনের প্রশ্ন। সোভিয়েট ইউনিয়ন ইউরোপে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে শান্তিপুর্ণ সহঅবস্থান এবং পরস্পরের প্রভাব-বলয়ে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার নীতি গ্রহণ করায় নয়াচীন এই নীতিকে 'সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ' আখ্যা দিয়ে নিন্দা করেছে। অনুরূপভাবে নয়াচীন এশিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সহঅবস্থান এবং নিজ নিজ প্রভাব-বলয়ের সীমা সম্প্রসারণের স্বার্থে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একযোগে এশিয়ার কোন কোন দেশে জাতীয় বিপ্লব ও মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষ বিরোধিতা করার নীতি গ্রহণ করায় একে 'সামাজিক নাৎসীবাদ' আখ্যা দেওয়া যায় কিনা, এই প্রশ্নটিও নিশ্চয়ই ভেবে দেখার মত।

আমাদের প্রসঙ্গটি তাত্ত্বিক নয়, নেহাৎ বৈষয়িক। বাঙলাদেশ সমস্যায় নয়াচীনের যে ভূমিকা, তাকে আদর্শের আলখেল্লা দিয়ে যতই মোড়ানো হোক এর পেছনে রয়েছে রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সংকীর্ণ বৈষয়িক স্বার্থ। এই বৈষয়িক স্বার্থহানির আশঙ্কায় পিকিংয়ের নেতারা সকল আদর্শ ও নীতিকথা ভুলে পিনডির ফ্যাসিস্ট সমরচক্রকে সমর্থন দিতে উঠেপড়ে লেগেছেন।

বাঙলাদেশের গত এক যুগের আর্থিক কাঠামোর দিকে তাকালে দেখা যাবে, বাঙলাদেশ পশ্চিম পাকিস্তানের কয়েকটি বিশেষ পণ্য ও ব্যবসায়ের একচেটিয়া বাজার, বলতে গেলে মনোপলি-মার্কেট। এই পণ্যের মধ্যে রয়েছে সুতীবস্ত্র, পশম-বস্ত্র, ওষুধ, বেবী ফুড, সর্বপ্রকার চামড়ার তৈরি জিনিস (যেমন জুতো, বেল্ট, ব্যাগ, স্যুটকেশ) সাবান, বনস্পতি তেল, সর্বপ্রকার প্রসাধন দ্রব্য, হালকা যন্ত্রপাতি, সিমেন্ট ও অন্যান্য গৃহনির্মাণ সামগ্রী, লোহা, পেরেক ইত্যাদি। বড় ব্যবসায়ের সঙ্গে ব্যাংক ও ইনস্যুরেনস ব্যবসাও পশ্চিম পাকিস্তানী বড় ব্যবসায়ীদের একচেটিয়া দখলে। কিন্তু গত বার বছরে পশ্চিম

পাকিস্তানের পরই যে দেশটি আমদানিকৃত দ্রব্যে বাঙলাদেশের বাজার ভরে ওঠে সে দেশটি হল নয়াচীন। ১৯৬২ সালে ভারত-চীন যুদ্ধ এবং ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পর বাঙলাদেশ প্রকৃতপক্ষে পশ্চিম পাকিস্তান ও নয়াচীনের যৌথ বাণিজ্যিক উপনিবেশে পরিণত হয়। আগে বাঙলাদেশের ছাপাখানার মালিকেরা প্রধানত আমেরিকা, জারমানী ও জাপান থেকে উন্নত মুদ্রণযন্ত্র এনে তাদের ছাপাখানা উন্নত ও আধুনিকীকরণের ব্যবস্থা করত, ছোট ও মাঝারি ছাপাখানাগুলো ভারত থেকে তুলনামূলক সস্তা দামে ট্রেড্‌ল মেসিন, টাইপ, সীসা ইত্যাদি সংগ্রহ করে তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখত। ভারত—বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে বাঙলাদেশের বাণিজ্যিক যোগাযোগ বন্ধ হওয়ার পর বহু ছোট ও মাঝারি ছাপাখানা ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান লুপ্ত হয়ে যায়। বাঙলাদেশ ছোট ও মাঝারি ব্যবসায়ীদের এই সংকটের সুযোগ গ্রহণ করে নয়াচীন। ত্‌'পেনিয়ামের উপর নির্মিত হালকা ডবল-ডিমাই ও ডিমাই সাইজের প্রিন্টিং মেসিন ট্রেড্‌ল মেসিন ও প্রুফ তোলার মেসিনে বাঙলাদেশ ভরিয়ে দেওয়া হয়। নিকৃষ্ট অথচ দামে কম এই মেসিনের প্রতি বাঙালী ছোট ও মাঝারি ছাপাখানার মালিকেরা সহজেই আকৃষ্ট হন। এ ছাড়া অন্য যে-সব পণ্য পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যাপক বাণিজ্যিকভিত্তিতে তৈরি হয় না, সে-সব চীনা পণ্যে বাংলাদেশ ভরে ওঠে। যেমন, অস্ত্রোপচারের যন্ত্রপাতি, সূঁচ, আলপিন, ডট্‌পেন রিফিল, ঘড়ির চেন, ব্যানড, সাদা কাগজ, চায়ের কাপ, ডিস-প্লেট ও অন্যান্য তৈজস পত্র, স্ট্যাপলার, লেখার কালি ফাউনটেনপেন, সাইকেল মেরামতের খুচরা যন্ত্রপাতি, টাইম-পিস্‌, ওয়াল-ক্লক, সবপ্রকার স্টেশনারী দ্রব্য থার্মোমিটার হালকা কৃষি ও ইঞ্জিনিয়ারিং যন্ত্রপাতি প্রভৃতি। ভারতীয় দ্রব্য আমদানি সম্পূর্ণ বন্ধ করে এবং কোন কোন দেশের উৎকৃষ্ট পণ্যকে প্রতিযোগিতায় নামতে না দিয়ে চীনা পণ্যের উপর বাণিজ্যিক বিধিনিষেধ ও শুল্ক হ্রাস করে তা যথেষ্ট সস্তায়

বিক্রি কবাব সুযোগ দেওয়ায় সম্পূর্ণ আমদানি-নির্ভর বাঙলাদেশ পশ্চিম পাকিস্তান ও নয়াচীনের প্রায় একচেটিয়া পণ্যেব বাজারে পরিণত হয। বড বড় ব্যবসা ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানে পশ্চিম পাকিস্তানেব কয়েকটি বড় পবিবাব ও পাশ্চাত্তোব কোন কোন দেশের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ বেখে ছোট ও মাঝাবি শিল্পোদ্যোগেব ক্ষেত্রে চলে বাঙালী উৎপাদনেব অভিযান। ১৯৬৮ সালে ঢাকা চেমবাব অব কমাবসেব জনৈক কর্মকর্তা আক্ষেপ কবে সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে বলেন, 'পাকিস্তানে—এমন কি বাঙলাদেশেও বড ব্যবসাযে বাঙালীব কোন অংশীদাযিত্ব নেই। মাঝাবি ও ক্ষুদ্র শিল্পেব ক্ষেত্রেও আমাদেব উদ্যোগ ও উৎসাহ ধ্বংস কবাই হচ্ছে। দেশেব সবগুলো বড ব্যাংক পশ্চিম পাকিস্তানীদেব কুক্ষিগত থাকায তাদেব ক্রেডিট ফেসিলিটি ও পলিসি আমাদেব স্বার্থেব অনুকূল নয। অবস্থা যা দাডিয়েছে, আভ্যন্তবীণ প্রযোজন মেটানোব জন্য একটা আলপিন তৈবিব সুযোগও আমাদেব দেওযা হবে না। পশ্চিম পাকিস্তানীরা যে সব পণ্য বাঙলাদেশেব বাজাবে পাঠাতে পাবছে না, সেগুলো আসছে চীন থেকে। আমবা এক দিকে পশ্চিম পাকিস্তানেব বাজনৈতিক কলোনী এবং অন্য দিকে যৌথভাবে পশ্চিম পাকিস্তান ও নযাচীনেব বফতানি বাজাব। বর্তমানে কাঁচামাল বফতানি ছাডা আমাদেব অন্য কোন ভূমিকা নেই—কিন্তু বফতানি নিযন্ত্রণেব ক্ষমতাও পিনডিব হাতে, আমাদেব হাতে নয।' ঢাকাব বাজাবে গত জুন মাস পর্যন্ত কোন কোন বিদেশী পণ্যেব তুলনায় চীনা পণ্যেব দাম কত ছিল তা উল্লেখ কবলেই বিষযটি আবও পরিষ্কার হবে।

একটি ব্রিটিশ থাবমোমিটাব—সাডে চাব টাকা (পাকিস্তানী মুদ্রাব হিসাবে)।

একটি চীনা থাবমোমিটাব—৭৫ পযসা।

একটি ইতালীয়ান ডট্পেন—সাড়ে তিন টাকা।

একটি ভালো চীনা ডট্পেন—এক টাকা।

সাধারণ চীনা ডট্‌পেন—৩৭ পয়সা।

একটি জাপানী স্টীল ব্যাণ্ড (ঘড়ির)—আট টাকা থেকে নয় টাকা।

একটি চীনা স্টীল ব্যাণ্ড (ঘড়ির)—এক টাকা থেকে আড়াই টাকা।

ফাউণ্টেনপেনের কালি—আড়াই টাকা থেকে তিন টাকা।

চীনা ফাউণ্টেনপেনের কালি—৬২ পয়সা।

বিয়ারের বোতল (মারীতে তৈরি)—নয় টাকা।

বিয়ারের বোতল (চীনে তৈরি)—দেড় টাকা।

একটি জাপানী ডবল-ডিমাই ছাপার মেসিন (ফ্লাট বেড)—২৩ হাজার টাকা।

একটি চীনা ডবল-ডিমাই ছাপার মেসিন (ফ্লাট বেড)—৯ থেকে ১২ হাজার টাকা।

এখানে উল্লেখ্য যে, চীনে তৈরি জিনিসপত্র বাঙলাদেশে আসতে শুরু করার সময় এ দাম আরও কম ছিল। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানী আমদানিকারকেরা এগুলো আমদানি করার পর বাঙলাদেশে রি-এক্সপোর্টের ব্যবসা শুরু করেন এবং প্রতিটি আমদানিকৃত আইটেমে শতকরা শত ভাগ মুনাফা লুটতে থাকেন।

সবচেয়ে বেশি কেলেঙ্কারী হয়েছে চীনা কয়লা নিয়ে। ১৯৬৫ সালের সেপটেমবর যুদ্ধের পর বাঙলাদেশে উন্নয়ন-পরিকল্পনা ও কল-কারখানার উৎপাদন দ্রুত হ্রাস পেতে শুরু করে। ১৯৬৬ সালেই বাঙলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা ও সংবাদপত্র ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য-সম্পর্ক পুনঃস্থাপন এবং তুলনামূলকভাবে অনেক কম দামে ভারতীয় কয়লা বাঙলাদেশে আমদানির ব্যবস্থা করে উন্নয়ন ও উৎপাদনের শ্লথ গতি পুনরায় চাঙা করার দাবি তোলেন। পিন্ডির জঙ্গীচক্র এই দাবিতে কর্ণপাত করেননি। বরং সাত-সমুদ্র ঘুরে

চীনা কয়লা অনেক বেশি দামে এনে বাঙলাদেশের জ্বালানি সমস্যা ও কলকারখানার চাহিদা মেটানোর নীতি অব্যাহত রাখেন। এই কয়লার দাম বেশি এবং বহুদূর থেকে সরবরাহ অনিশ্চিত হওয়ায় বাঙলাদেশের অর্থনীতিতে মন্দার ভাব বাড়তে থাকে এবং ব্যবসায়ী-মহলে ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য-সম্পর্ক চালু করা এবং ভারতে পাট ও মাছ রপ্তানি এবং সেখান থেকে বাঙলাদেশে তুলা, কয়লা ও কাঠ প্রভৃতি আমদানির সুযোগ দেওয়ার দাবি তীব্র হয়ে ওঠে। বাঙলা-দেশের ডানপন্থী সংবাদপত্র যেমন 'পাকিস্তান অবজারভার' ও 'পূব দেশে' পর্যন্ত এই সময় সম্পাদকীয় স্তম্ভে বলা হয়, রাজনৈতিক বিরোধ সত্ত্বেও যদি কোন কোন কম্যুনিস্ট ও অ-কম্যুনিস্ট দেশের মধ্যে পারস্পরিক স্বার্থে বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারে, তা হলে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে কেন বাঙলাদেশের বাণিজ্য সম্পর্ক চালু হবে না? এই স্বাভাবিক বাণিজ্য-সম্পর্ক চালু করা না হলে বাঙলা-দেশের অর্থনৈতিক বিপর্যয় ঠেকানো যাবে না। ইরান ও তুরস্কের সঙ্গে পাকিস্তান যে আর সি ডি বা আঞ্চলিক উন্নয়ন জোট গঠন করেছে, ভৌগোলিক দূরত্ব ও বিচ্ছিন্নতার জন্য বাঙলাদেশ সেই জোট দ্বারা কিছুমাত্র উপকৃত হবে না। বাঙলাদেশকে যদি বাঁচাতে হয় তা হলে তাকে প্রতিবেশী পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, আসাম ও বরমার সঙ্গে আঞ্চলিক উন্নয়ন জোট গঠন করতে দিতে হবে।

স্বাধীন বাঙলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে এশিয়ায় নয়াচীনের একক বৃহৎ রাষ্ট্রের ভূমিকা গ্রহণের উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণের পথেই যে শুধু বাধা সৃষ্টি হল তা নয়, তার আশু ক্ষতি একটি বিরাট একচেটিয়া বাজার হাতছাড়া হওয়া। তা ছাড়া ক্যান্টন-ঢাকা-বিমানপথের রাজনৈতিক ও সামরিক গুরুত্বও কম নয়। তাই বাঙলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধ যতই আদর্শ ও নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হোক না কেন, আশু বৈষয়িক ও বাণিজ্যিক ক্ষতির আশঙ্কায় পিকিংয়ের পক্ষে সম্ভবত উচ্চকণ্ঠ না হয়ে উপায় নেই।

চীন ও আমেরিকার কেন এই পক্ষপাত

রণজিৎ রায়

বাংলাদেশ এবং পাক-ভারত যুদ্ধের ব্যাপারে ওয়াশিংটন এবং পিকিং একই মনোভাব নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে বলে মনে হয়। তারা দু'জনেই জানেঃ ভারত আক্রমণকারী নয়; কিন্তু সব জেনে-শুনেও তারা ভারত পাকিস্তানকে আক্রমণ করেছে বলে অভিযোগ করেছে। পাকিস্তানের পছন্দ-মাফিক যুদ্ধ-বিরতি ঘটানোর জন্য তার দুই বন্ধুই একইভাবে চেষ্টা করেছে, করছে। সদ্য খবর এসেছেঃ হিমালয়ের অপর প্রান্তে চীন তার সৈন্য সমাবেশ করতে শুরু করেছে। খবরটা অবশ্য পাকাপাকিভাবে স্বীকৃত হয়নি। পাশাপাশি খবর এসেছেঃ শ্রীনিকসন তাঁর দেশের সপ্তম নৌবহরকে বঙ্গোপসাগরের দিকে এগিয়ে আসতে নির্দেশ দিয়েছেন। এ খবরটা গত সপ্তাহেই এই নিবন্ধে জানিয়েছিলাম।

তবু ওয়াশিংটন এবং পিকিং পারস্পরিক যোগ-সাজসের মাধ্যমে অগ্রসর হচ্ছে ভাবলে বেশি ভাবা হয়। ওদের রাজনীতিক এবং সামাজিক পদ্ধতিতে পার্থক্য আমূল। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় দু' দেশের লক্ষ্যও সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। কমিউনিজম প্রতিরোধের ডালেস-নীতি যে চরম ব্যর্থ হয়েছে, ভিয়েতনামকে পদানত করার প্রয়াসে আমেরিকার সেনাবাহিনীর মর্যাদাও যে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত, চীনের সঙ্গে আমেরিকার ভালো সম্পর্ক গড়ে তোলার মরীয়া প্রয়াস তারই ইঙ্গিত দেয়। তবু, আন্তর্জাতিক সমস্যাদির ব্যাপারে মিলে-মিশে ব্যবস্থা গ্রহণের পক্ষে দুটি দেশের পার্থক্যগুলি খুবই প্রখর।

পঞ্চাশের দশকে ওয়াশিংটন এবং পিকিং—উভয়েই ভারতকে বন্ধু

রূপে পাওয়ার চেষ্টা করেছিল। কারণ, ভারতের অবস্থান সামরিক দিক থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ; তাছাড়া, অর্থনীতিক দিক থেকেও ভারত দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দেশ। শ্রীডালেস তাঁর কমিউনিজম-বিরোধী শৃঙ্খলে ভারত এবং পাকিস্তান—উভয়কেই গ্রথিত করতে চেয়েছিলেন। ভারতকে পারেন নি, পাকিস্তানকে পেরেছিলেন।

পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি থেকে আমেরিকা শুধু যে পাকিস্তানের সামরিক শক্তিই গড়ে দিয়েছে তাই নয়; তার আর্থিক বনিয়াদ গড়ার দায়িত্বও নিয়েছে। পঞ্চাশের দশকের শেষ দিকে মস্কো-পিকিং বিবাদ বেশ পাকিয়ে উঠতে শুরু করলে ভারত সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পাকিস্তান চীনের দিকে ঝুঁকতে শুরু করে। ১৯৬২-এর যুদ্ধের পর পাকিস্তান চীনের দিকে আরো বেশি করে ঝুঁকে পড়ে। এই ঝোঁকের শিকার হন্ সেণ্টো এবং সিয়াটো। ঐ দুই সামরিক জোট ভেঙে দেওয়া না হলেও আমেরিকা এবং পাকিস্তান সমেত সকলেই বুঝতে পারে: জোট দুটিতে প্রাণের চিহ্ন আর অবশিষ্ট নেই।

চীনের সঙ্গে ভারতের একটানা বৈরিতার সম্পর্ককে আমেরিকা এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন—উভয়েরই পছন্দ। কিন্তু এর ফলেও ভারত পেণ্টাগনের খপ্পরে পা দেয়নি। অন্যদিকে আমেরিকার উপর পাকিস্তানের নির্ভরতা বাড়তেই থাকে। জটিল কূটনীতির দুনিয়ায় ভারত সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়; পাকিস্তান একদিকে ওয়াশিংটন, অন্য দিকে পিকিং—এই দুই বিপরীত মেরু থেকে সামরিক এবং কূটনীতিক সহায়তা জোটাতে থাকে। পৃথক পৃথক কারণে আমেরিকা এবং চীন—দুইয়ের কেউই ভারত একটি বৃহৎ শক্তি হয়ে দাঁড়াক তা চায় না। পাকিস্তান টুকরো হয়ে গেলে এই উপ-মহাদেশে ক্ষমতার নিক্তি ভারতের দিকেই ভারি হওয়ার কথা। চীন এবং আমেরিকা তা চায় না; অথচ এ ব্যাপারে তাদের বিশেষ কিছু করণীয় নেই।

জেনারেল ইয়াহিয়া বাংলাদেশে জল্লাদ-বৃত্তি শুরু করার পর পাকিস্তান আর আগের পাকিস্তান থাকার কথা কেউই ভাবতে পারছেন না। ওয়াশিংটন এবং পিকিং ইসলামাবাদের প্রতি সমর্থন বজায় না রাখলে তারা পশ্চিম পাকিস্তানের বন্ধুত্ব হারাবে; অথচ ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে তার ক্ষতিপূরণ হবে না। সে রকমটি হলে ইসলামাবাদ তখন হয়ত ওয়াশিংটন এবং পিকিং প্রতিশ্রুতি রাখছে না দেখে তাঁদের ছেড়ে মস্কোর দিকেই ঝুঁকত।

এই নিরিখেই ওয়াশিংটন এবং পিকিং-এর আচরণ বিচার্য। নিরাপত্তা পরিষদে ওরা দু'জনেই পাকিস্তানের পক্ষ নিয়েছে, নেবে। সপ্তম নৌবহরের বঙ্গোপসাগরমুখী অভিযান কিংবা তিব্বতে চীনা সৈন্য সমাবেশ মানেই এই নয় যে, ঐ দুই দেশ পাকিস্তানের হয়ে ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য উন্মুখ। তারা জানে যে, তারা তা করলে সোভিয়েত ইউনিয়নও এসে পড়বে; শেষ পর্যন্ত পৃথিবী এক দীর্ঘায়ত যুদ্ধের সম্মুখীন হবে।

আমেরিকা এবং চীনের সশস্ত্র বাহিনীর সমাবেশের সংবাদকে ভারত সবকার সামরিক দিক থেকে বিশেষ তাৎপর্য পূর্ণ মনে করেন না। সোমবার রাত্রে ভারত সরকারের একজন মুখপাত্র এই কথাই বিশেষ করে বোঝাতে চেয়েছেন।

ওয়াশিংটন এবং পিকিং-এর লক্ষ্য মুখ্যত রাজনীতিক। ঐ লক্ষ্য পূরণের জন্য তারা নয়াদিল্লীব উপর চাপ সৃষ্টি করতে চায়। নিরাপত্তা পরিষদে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেটো প্রয়োগ করে ভারতকে বাঁচিয়েছে। সাধারণ পরিষদও বিপুল ভোটের ব্যবধানে পাক-ভারত যুদ্ধ সম্পর্কে মোটামুটি একই ধরণের প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। সোভিয়েত ব্লক ছাড়া সারা পৃথিবীতে ভারতের আজ আর বন্ধু নেই বললেই হয়। এটা মোটেই কাম্য অবস্থা নয়। আমেরিকা এই অবস্থাটাকেই কাজে লাগাতে চাচ্ছে, তার জন্য ভারতের উপর সে চাপ সৃষ্টি করতে চায়। সপ্তম নৌবহরের অভিযান সেই ইঙ্গিতই দেয়।

ভারত-বিশ্বজনমত লঙ্ঘন করেছে বলে আমেরিকা চেঁচামেচি করছে। কিন্তু জনমতকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে এবং দীর্ঘ নয় মাস ধরে বাংলাদেশে পাশবিক নিষ্ঠুরতা চালিয়ে ইয়াহিয়া যে বিশ্ববাসীর ঘৃণা কুড়াচ্ছে—ওয়াশিংটনের সে কথাটাও এতদিনে উপলব্ধি করা উচিত ছিল। সোভিয়েত উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীকুজনেৎসভের দিল্লী অবস্থান-কালে কূটনীতিক মহল থেকে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যাচ্ছে যে, তলে তলে আমেরিকা এবং চীনও একটি সার্বভৌম দেশ হিসাবে বাংলা-দেশের অভ্যুদয়কে মেনে নিতে শুরু করেছে। একটি সমগ্র জাতি বিদ্রোহী হয়ে উঠলে দীর্ঘকাল যে কোন জঙ্গী প্রশাসন টিকে থাকতে পারে না—সে কথাটাও তাঁরা বুঝতে শুরু করেছেন বলে ঐসব সূত্রে জানা যাচ্ছে।

যতদিন বাংলাদেশে যুদ্ধ শেষ না হচ্ছে এবং সেখানে পাকিস্তানী বাহিনী সম্পূর্ণ পরাজিত না হচ্ছে ততদিন ভারতের অসুবিধাজনক অবস্থাটা চলতে থাকবে। কিন্তু ঢাকায় একবার মুক্তিবাহিনীর পতাকা উড়লে শুধু অন্যান্য দেশ কেন, ওয়াশিংটন এবং পিকিংও বাংলাদেশকে মেনে নেবে। অবশ্য তারা বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়াব ব্যাপারে কালক্ষেপ করতে পারে।

ভারতীয় বাহিনী এবং মুক্তিবাহিনী দ্রুত তাদের দায়িত্ব সম্পাদন করে ফেলছে না বলে যারা অখুশী তাদের বোঝা উচিত যে, পৃথিবীর এক অতি দুরধিগম্য এলাকায় যুদ্ধ চলছে। তা সত্ত্বেও মুক্তিবাহিনী যে গতিতে ঢাকার কাছে পৌঁছে গিয়েছে তা খুবই প্রশংসনীয়।

তাছাড়া যাতে অসামরিক ব্যক্তিরা নিহত না হয় এবং অসামরিক বস্তু বেশি নষ্ট না হয় মুক্তিবাহিনী সেদিকেও বিশেষ করে লক্ষ্য রাখছে। সেজন্যেই সাধারণত যুদ্ধে যা করা হয় সেভাবে ঝটিতি আক্রমণ করে শহরগুলি ধ্বংস করে ফেলা হচ্ছে না। যাতে ঢাকাস্থিত পাকসৈন্যরা নিজেরাই ধরা দেয় তার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে। তাহলে সরাসরি আঘাত হানা এড়ানো যাবে। আপাতভাবে এতে অনেকের

ধৈর্যচ্যুতি ঘটতে পারে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এর ফল ভালো হবে। এরকম পরিস্থিতিতে কিছুটা দেরি হওয়ার কারণ সহজবোধ্য।

স্বাধীন বাংলাদেশ বাস্তব সত্য হয়ে উঠছে কি না ওয়াশিংটন এবং পিকিং বর্তমানে সে প্রশ্নে খুব চিন্তিত নয়; ভারত পশ্চিম পাকিস্তানে প্রবেশ করে শক্তির দ্বারা কাশ্মীরে যুদ্ধবিরতি সীমারেখা নতুন করে নির্ধারণ করতে চলেছে কি না সে সম্পর্কে তারা বেশি চিন্তিত। মস্কোও এরকম প্রলোভনের বিরুদ্ধে নয়াদিল্লীকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছে।

পশ্চিম খণ্ডেও পাকবাহিনীকে পরাস্ত করা এবং যুদ্ধবিরতি সীমারেখা অমান্য করার জন্য কোন কোন মহল থেকে সরকারের উপর চাপ এলেও ভারত সরকার ঐরকম ইচ্ছাকে কখনোই প্রশ্রয় দেননি। সত্যি বলতে কী: প্রথম দিকে নয়াদিল্লী ঘোষণাই করেছিল যে, পশ্চিমখণ্ডে ভারত আত্মরক্ষামূলক ভঙ্গিতেই যুদ্ধ করবে।

ইসলামাবাদই পশ্চিমখণ্ডে আক্রমণ শুরু করে এবং আমাদের দুর্বল এলাকা খুঁজতে থাকে। তার জন্য পাকিস্তান ছামব এলাকা বেছে নেয় এবং সেখানে বড় রকমের যুদ্ধ হয়। ভারতও পাল্টা ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হয় এবং সামরিক ও কৌশলগত কারণে পাকিস্তানের কিছু ঘাটি ও এলাকা দখল করে।

এই অবস্থাতে এসেই ভারতীয় মুখপাত্র যুদ্ধবিরতি সীমারেখাকে 'তথাকথিত' সীমানা বলে আখ্যা দেন। কোন কোন দেশ এটাকে এই বলে ব্যাখ্যা করছে যে, ভারত পাকিস্তান-অধিকৃত কাশ্মীর শক্তির দ্বারা অধিকার করতে চায়। কিন্তু ভারতের যে সেরকম কোন অভিপ্রায় নেই ভারত সে সম্পর্কে ঐসব দেশকে পুনরায় আশ্বাস দিয়েছে। এতে ওয়াশিংটন এবং পিকিং-এর খুশী হওয়া উচিত।

একটি দুর্গের পতন।। ঢাকা আর কতক্ষণ

আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী

প্রত্যাশিত সময়ের আগেই যশোর সামরিক চাউনি ও দুর্গের পতন ঘটেছে। যশোর দুর্গে প্রায় বিশ হাজার পাকিস্তানী সৈন্য থাকার কথা এবং দুর্গরক্ষার জন্য এই সৈন্যদের পক্ষ থেকে একটা বড় রকমের প্রতিরোধ-যুদ্ধ আশঙ্কা করা হচ্ছিল। এও মনে করা হচ্ছিল বাঙলাদেশে মুক্তিবাহিনীর সহায়তায় ভারতীয় সৈন্য অধিকাংশ শহর ও গ্রাম মুক্ত করতে পারলেও ক্যান্টনমেন্ট শহরগুলো মুক্ত করা সহজ হবে না। বরং লোকক্ষয় এড়ানোর জন্য. ভারতীয় বাহিনীকে দীর্ঘ সময় এই সেনাবাস শহরগুলো অবরোধ করে রাখতে হবে। কিন্তু যশোর দুর্গ মুক্ত করার পর দেখা গেছে, সেখানে বিপুল সংখ্যক পাকিস্তানী সৈন্য মোটেই নেই। বরং নিশ্চিত পরাজয়ের মুখে তারা আগেই পালিয়েছে।

যে যাই বলুন, পাকিস্তানী সৈন্যরা যশোর ছেড়ে গোপনে পশ্চিম পাকিস্তানে প্রস্থান করেছে এমন ধারণা সম্ভবত সঠিক নয়। তারা ঢাকার দিকে সরে গেছে এবং সরে গেছে সম্ভবত বেশ কিছুদিন আগেই। একবার এক পাকিস্তানী সামরিক বিশেষজ্ঞ বলেছিলেন, ভারতের সঙ্গে সম্ভাব্য কোন যুদ্ধে বাঙলাদেশে তাদের হার হলে তারা যে কোন মূল্যে ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং যশোর রক্ষার চেষ্টা করবেন। কারণ, জলপথে চালনা ও চট্টগ্রাম বন্দর এবং আকাশপথে ঢাকা বিমানবন্দর হচ্ছে তাদের শেষ একজিট রুট বা প্রস্থান পথ। এবারের যুদ্ধে তাই স্বাভাবিক ভাবেই চালনা বন্দরের জন্য যশোর দুর্গ রক্ষার একটা বড় রকমের চেষ্টা হবে এটা ধরেই নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু

এই চেষ্টা হল না কেন? এটা অনেকের কাছেই একটা বড় রকমের ধাঁধা।

কিন্তু এই ধাঁধার উত্তরটি বড় সরল। বাঙলাদেশের দখলীকৃত এলাকায় অভিযান চালাতে গিয়ে ভারতীয় বাহিনী শুধু স্থলপথে এগোয়নি, জলপথ ও আকাশপথেও প্রাধান্য বিস্তার করেছেন। ভারতীয় নৌবাহিনী গোটা বঙ্গোপসাগর অবরোধ করে ফেলেছেন। এই অবস্থায় চালনা ও চট্টগ্রাম বন্দর কার্যত পাকিস্তানী সৈন্যদের কাছে গুরুত্বহীন। এই দুটি বন্দরের মাধ্যমে এখন সাগর পথে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে রসদ বা সাহায্য আনা এবং জরুরী মুহূর্তে পলায়ন দুইই অসম্ভব। সুতরাং ঢাকা থেকে বহুদূরে এবং ভারতীয় সীমান্তের একেবারে কাছাকাছি যশোর ক্যান্টনমেন্ট রক্ষার জন্য শক্তিক্ষয় ও লোকক্ষয় পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনী পরিহার করাই উত্তম কাজ মনে করেছে। যশোর দুর্গ রক্ষার জন্য পরাজয় নিশ্চিত জেনেও তারা বড় রকমের লড়াই করতে প্রস্তুত হত, যদি যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই তিনটি স্যাবার জেট ধ্বংস হয়ে আকাশ-পথে তাদের প্রাধান্য খর্ব না হতো। আকাশ-যুদ্ধে এই আকস্মিক ও বড় রকমের পরাজয় যশোর দুর্গ রক্ষা করা তাদের কাছে আরও অপ্রয়োজনীয় করে তুলেছে। কারণ, 'এয়ার-কভার' ছাড়া ঢাকার মূল ঘাঁটি থেকে নদীপথে বিচ্ছিন্ন এত দূরের সামরিক ছাউনি রক্ষা করা দুরূহ। স্থল, জল ও আকাশ পথে ভারতীয় বাহিনীর দুর্বার অভিযানের মুখে মূল ঘাঁটি থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় প্রচুর অস্ত্রশস্ত্রসহ ১৫ থেকে ২০ হাজার সৈন্য ফেলে রাখা পাকিস্তানী সেনাধ্যক্ষগণ স্বাভাবিকভাবেই সঙ্গত মনে করেননি। কারণ, এত বিপুল সংখ্যক সেনা আক্রান্ত, পরাজিত বা ধৃত হলে (এবং যা হতই) মূল ঘাঁটি ঢাকার সৈন্যদের মনোবল একেবারেই ভেঙে পড়তো এবং পশ্চিম পাকিস্তান থেকে দেড় হাজার মাইল দূরে প্রায় অবরুদ্ধ অবস্থায় এদের দিয়ে যুদ্ধ পরিচালনা আরো অসম্ভব হয়ে দাঁড়াতো। মনোবল অবশ্য এমনিতেই ভেঙে গেছে মূল ঘাঁটি ঢাকা

ক্যান্টনমেণ্টের পাকিস্তানী সৈন্যদের। তবে অন্যান্য ক্যান্টনমেণ্ট থেকে সৈন্য সরিয়ে এনে বিপুলভাবে এদের সংখ্যাবৃদ্ধির দ্বারা মনোবল যতটুকু চাঙ্গা করা যায়, ততটুকুই পাকিস্তানী সামরিক শাসকদের লাভ। কারণ, বাঙলাদেশে যুদ্ধ করতে তারা চান না—সে যুদ্ধের সাধ তাদের মিটে গেছে। তারা চান, যত দীর্ঘ সময় সম্ভব বাঙলাদেশের একটি ফ্রণ্টে অন্তত ভারতীয় সেনাদের ব্যস্ত ও ব্যাপৃত রাখতে, যাতে পশ্চিম খণ্ডের যুদ্ধে পাকিস্তানী সৈন্যেরা অন্ততঃ শ্বাস ফেলার সময় পায়।

যশোর ও সিলেটের পর চট্টগ্রাম শহর এবং বন্দরও প্রায় বিনা বাধায় মুক্ত হবে এটা আশা করা যায়। সমুদ্রপথ অবরুদ্ধ হওয়ায় চট্টগ্রাম বন্দরও কার্যত পাকিস্তানী সৈন্যদের কাছে গুরুত্বহীন। তাই প্রয়োজনে কুমিল্লার ময়নামতী ক্যানটনমেনট থেকেও দ্রুত সরে গিয়ে ঢাকার চারপাশে তারা শক্ত ব্যূহ তৈরী করবে, এমন একটা ধারণা পোষণ করা নিশ্চয়ই অসঙ্গত নয়। ভারতের সামরিক বিশেষজ্ঞেরাও নিশ্চয়ই এমন একটি ধারণা থেকে ঢাকার উপর বিমান আক্রমণের চাপ অব্যাহত রেখেছেন এবং চারদিক থেকে ঢাকা শহরকে ঘিরে ফেলার চেষ্টা করছেন। অন্যদিকে ঢাকার অভ্যন্তরে মুক্তিবাহিনীর গেরিলা ইউনিটও অত্যন্ত তৎপর হয়ে উঠেছেন। এখন ভিতর ও বাইরের আঘাতে বেসামাল অবরুদ্ধ প্রায় পাকিস্তানী সৈন্যদের মনোবল কতদিন অটুট থাকে তার উপরই বাঙলাদেশে যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরম প্রত্যাশিত মুহূর্তটি এগিয়ে আসা নির্ভর করছে। যদি সশস্ত্র ও সুরক্ষিত দুর্গে অবস্থান সত্ত্বেও তারা আত্মসমর্পণ করে, তাহলে বুঝতে হবে, যুদ্ধ করার সাহস ও মনোবল তারা হারিয়ে ফেলেছে। আর পরাজিত হওয়ার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যদি তারা যুদ্ধ করে, তাহলে বুঝতে হবে পশ্চিম খণ্ডের যুদ্ধে পাকিস্তানী বাহিনী সুবিধা করতে পারবে এই দুরাশায় পূর্বখণ্ডে তারা মরিয়া হয়ে লড়তে চাইছে।

এখন প্রশ্ন, পশ্চিম খণ্ডের যুদ্ধে পাকিস্তানের প্রত্যাশা পুরণের

সম্ভাবনা কতটুকু? যে প্রত্যাশায় জেনারেল ইয়াহিয়া মাত্র দশ দিনের মধ্যে যুদ্ধে নামবেন বলে হুঙ্কার ছেড়েছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে নেমেছেন, সেই প্রত্যাশা আসলে পশ্চিম খণ্ডের যুদ্ধে অর্থাৎ কাশ্মীর ও পাঞ্জাব সীমান্তে ভারতকে কাবু করা। এই প্রত্যাশা পাকিস্তানী সামরিক নেতাদের বহুদিনের। পাকিস্তানের এক কালের সোহারাওয়ার্দী-মন্ত্রিসভার সিনিয়র সদস্য আবুল মনসুর আহমদ তাঁর স্মৃতিকথায় (পঞ্চাশ বছরের রাজনীতি) লিখেছেন, ১৯৫৭ সালে ঢাকায় রাজভবনে পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা সমস্যা সম্পর্কে এক ঘরোয়া আলোচনা চলছিল। আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী সোহারাওয়ার্দী এবং প্রধান সেনাপতি জেনারেল আইয়ুব স্বয়ং। বাঙলাদেশের (তখনকার পূর্ব পাকিস্তান) দুর্বল প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার কথা উঠতেই জেনারেল আইয়ুব হেসে বলেছেন, ঘাবড়াইয়ে মাৎ। আমরা জানি, ভারতের দ্বারা চারদিকে বেষ্টিত বাঙলাদেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা অত্যন্ত দুর্বল। কিন্তু ভারত বাঙলাদেশ দখল করলে কি হবে জানেন আমাদের সৈন্যেরা সাত দিনের মধ্যে দিল্লীর লালকেল্লা দখল করবে।'

শুধু বলা নয়, দিল্লী দখলের এই মিথ যাতে বাঙালীদের মনে স্থায়ীভাবে দাগ ফেলে তজ্জন্য পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই সামরিক চক্র নানাভাবে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এই অতি কথনের ফাঁকি সর্বপ্রথম ধরা পড়ে ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসের যুদ্ধে। এই সময়ের যুদ্ধে ভারত পাকিস্তানী সৈন্যকে পূর্বখণ্ডে বিব্রত না করা সত্ত্বেও এক পশ্চিম খণ্ডের যুদ্ধেই পাকিস্তান কার্যতঃ পরাজিত হয়। এই পরাজয়ের অগৌরব ঢাকার জন্য সামরিক চক্রের একাংশ আইয়ুব খাঁর ঘাড়ে সব দোষ চাপিয়ে তাকে ক্ষমতা থেকে অপসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করে। ১৯৬৬ সালের ১৯শে জানুয়ারি তারিখে জেনারেল আইয়ুব দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে যুদ্ধের প্রকৃত পরিস্থিতি এবং তাসখন্দ চুক্তি বিশ্লেষণের জন্য লাহোরের রাজভবনে জন্য লাহোরের

রাজভবনে এক সভা ডাকেন। সাংবাদিক হিসাবে এই সভায় আমিও উপস্থিত ছিলাম। জনৈক পশ্চিম পাকিস্তানী সম্পাদকের ক্রুদ্ধ প্রশ্নের জবাবে জেনারেল আইয়ুব বিব্রত ভাবে বলেন, আমি এখন যা বলছি, তা অফ দি রেকর্ড, একথা সবাই যেন মনে রাখেন। আসলে আফগান সৈন্য আমাদের সীমান্তে মোতায়েন হওয়ায় এবং পাখতুনিস্থান প্রশ্নে তুরখাম ও খাইবার থেকে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কায় আমরা ভারতের বিরুদ্ধে পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করতে পারিনি। এটাই যুদ্ধে আমাদের বিপর্যয়ের বড় কারণ।'

আইয়ুবের এই গোপন ব্যাখ্যা পশ্চিম পাকিস্তানী সম্পাদকেরাও সেদিন বিশ্বাস করেননি। তার সহযোগী জেনারেলরা শুনে সম্ভবতঃ মচকি হেসেছিলেন :

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর নির্বাসিত জারমান সম্রাট কাইজার বলেছিলেন, আমি যে ভুল করেছিলাম হিটলারও সেই ভুলই করতে যাচ্ছেন। আজ আইয়ুবও সম্ভবতঃ জেনারেল ইয়াহিয়াকে এই একই কথা বলতে পারতেন। ইয়াহিয়া ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধায়োজন করছেন সেই মাচ মাস থেকেই এবং মাঝখানে শান্তিবাণী কাচিয়েছেন কেবল পূর্ণ প্রস্তুতিব জন্য। তার এই প্রস্তুতি বাঙলাদেশ হাতছাড়া হলেও পশ্চিমখণ্ডে কাশ্মীর সহ ভারতীয় ভূখণ্ড গ্রাসের। তাই বাঙলাদেশের যুদ্ধ দীর্ঘকাল চলবে না—বরং তার সমাপ্তি আসন্ন এমন একটা ভবিষ্যৎবাণী বিনাদ্বিধায় করা চলে। পশ্চিম খণ্ডেও পাকিস্তানী জেনারেলরা একটা হিসাবের ভুল করেছেন। ভারতীয় নৌবাহিনীব শক্তি তারা পরিমাপ করেননি এবং সিন্ধুপ্রদেশে নতুন নতুন ফ্রনটে ভারতীয় অভিযানও তারা হয়ত প্রত্যাশা করেননি। ফলে বাঙলাদেশের ফ্রনট থেকে সরে গিয়েও পশ্চিম খণ্ডের এমন সব নতুন নতুন ফ্রনটে তারা অভিযান ও প্রত্যাঘাতের সম্মুখীন হয়েছেন, যা সেখানেও যুদ্ধকে একটা নিশ্চিত পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এ পরিণতি জেনারেল ইয়াহিয়া এবং তাঁর সামরিক চক্রের

জন্য স্বস্তিকর কিম্বা তাদের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা পুরণের অনুকূল হলে নিশ্চয়ই পুরনো মুরুব্বী আমেরিকা এবং নতুন দোস্ত লাল চীন জাতিসঙ্ঘ এবং জাতিসঙ্ঘের বাইরে যুদ্ধ-বিরতির জন্য এমন হন্যে হয়ে উঠতেন না।

মুক্ত বাংলায় এখনই অসামরিক প্রশাসন গড়ে তোলা চাই

বরুণ সেনগুপ্ত

বাংলাদেশের বুক থেকে পাকিস্তানের সকল চিহ্ন অবলুপ্তপ্রায়। রাজধানী ঢাকা মুক্ত হতেও আর খুব বেশি দেরি নেই। পাকিস্তানী সেনাবাহিনী এখন সমগ্র বাংলাদেশ থেকে পালাবার পথ খুঁজছে।

পাকিস্তান অবশ্য এরপরও নানাভাবে বাংলাদেশের উপর কর্তৃত্ব দাবি করবে। তারা রাষ্ট্রপুঞ্জে যাবে। বন্ধুদের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরবে। এবং নানাপথে বাংলাদেশে আবার অন্তত কিছুটা কর্তৃত্ব পাওয়ার চেষ্টা করবে।

নানাভাবে এই চেষ্টা করবে বলেই পাকিস্তান নুরুল আমিন নামক ব্যক্তিটিকে রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী বলে ঘোষণা করেছে। দেখাবে, এই আমাদের প্রধানমন্ত্রী, বাঙালী। এবং সেই দেখানো পুতুল প্রধানমন্ত্রীর মাধ্যমেই তারা বাংলাদেশের উপর দখল চাইবে।

এই ব্যাপারে পাকিস্তান প্রধান বন্ধু পাবে মারকিন যুক্তরাষ্ট্রকে। আর আছে চীন। মারকিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীন সঙ্গে থাকলে, বিশেষত মারকিন যুক্তরাষ্ট্র সঙ্গে থাকলে বহু ছোট রাষ্ট্রকেও সঙ্গে পেতে অসুবিধা হবে না। বাংলাদেশ পাকিস্তানেরই, তাই পাকিস্তানকেই বাংলাদেশে কর্তৃত্ব করতে দেওয়া হোক—এই দাবি মারকিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীনের নেতৃত্বে রাষ্ট্রপুঞ্জের দরবারে উঠবেই।

কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার একবার ঢাকায় পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে তারপর কি আর তাকে সরানো যাবে? পৃথিবীর যত শক্তিই চেষ্টা করুন, সেটা সম্ভব হবে না। অন্তত রাজনৈতিক প্রচেষ্টায় কখনও কোথাও তা সম্ভব হতে পারে না। যে সরকার

দেশের মানুষের অকুণ্ঠ সমর্থনে পুষ্ট তাকে রাষ্ট্রপুঞ্জের মাধ্যমে উচ্ছেদ করা যায় না। যদি তা করতে হয় তাহলে প্রয়োজন হবে সামিরিক অভিযান। অর্থাৎ সৈন্য পাঠিয়ে আবার বাংলাদেশে পাক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। সেটাও আর একা পাকিস্তানের দ্বারা সম্ভব নয়। পাক সৈন্যের পক্ষে একা আর বাংলাদেশে দখল ফিরিয়ে পাওয়া অসম্ভব—সে তারা যতই বিদেশী সাহায্য পাক।

পূর্ববাংলায় অর্থাৎ বাংলাদেশে আবার পাকিস্তানী কর্তৃত্ব ফিরিয়ে আনতে হলে মারকিন বা চীনা সৈন্যকে তাদের সমর্থনে অ্যাকসনে নামতে হবে। অর্থাৎ বাংলাদেশে পাক কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হলে মারকিন বা চীনা সৈন্যের মাধ্যমে তা করতে হবে।

কিন্তু মারকিন যুক্তরাষ্ট্র বা চীন মুখে যতই বলুক কার্যক্ষেত্রে তারা সৈন্যসামন্ত নিয়ে নামবে না—অন্তত পাক কর্তৃপক্ষকে ঢাকায় আবার বসিয়ে দেওয়ার জন্য চীন বা আমেরিকা কিছুতেই সৈন্য পাঠাবে না। রাষ্ট্রপুঞ্জের নামে সৈন্য পাঠানোও অসম্ভব।

তাই, ঢাকা থেকে পাকসৈন্য বিতাড়নের পর বাংলাদেশকে আবার পাকিস্তানের দখলে ফিরিয়ে দেওয়া কিছুতেই সম্ভব হবে না। বাংলাদেশে তখন পাকাপাকিভাবেই বাংলাদেশ সরকার বসবে। শুধু বাংলাদেশের মানুষই তখন বাংলাদেশের ভাগ্য নির্ধারণ করবে।

এইজন্যই যতদিন সম্ভব ঢাকায় দখল বজায় রাখার জন্য পাকিস্তান চেষ্টা করবে। এই আশায় যে যদি রাষ্ট্রপুঞ্জ বা বন্ধু রাষ্ট্রগুলি ততদিনে চাপ দিয়ে বাংলাদেশে তাদের কিছুটা কর্তৃত্ব বজায় রাখার ব্যবস্থা করতে পারে।

কিন্তু ভারত সরকার ইতিমধ্যেই পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন, বাংলাদেশের ব্যাপারে কারো চাপে তাঁরা কোনও রফা করবেন না। বাংলাদেশের সরকার বাংলাদেশে পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব-মুহূর্ত পর্যন্ত ভারতীয় সৈন্যরা এবং মুক্তিবাহিনী পাক দখলদারদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাবেই।

মারকিন যুক্তরাষ্ট্র বা চীন যে কোনও বিশেষ প্রেমবশত পাকিস্তানের মিত্র তা নয়। মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য ভারতকে শক্তিশালী হতে না দেওয়া। তারা জানে, পাকিস্তানেব বিষ দাঁত ভেঙ্গে গেলে, বাংলাদেশ ভারতের বন্ধু রাষ্ট্র হলে এবং ওইভাবে পূর্ব ও পশ্চিমের প্রতিরক্ষার জন্য ভারতকে প্রতি বছর শত শত কোটি টাকা খবচা না করতে হলে ভারত অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী হয়ে উঠবে। ভারতেব অর্থনীতি, ভারতেব শিল্প আরও মজবুত হবে। তাতে আমেরিকার নানা ক্ষতি। অর্থনৈতিক এবং বাজনৈতিক দুইভাবেই ক্ষতি। তাই মাবকিন যুক্তরাষ্ট্র ভাবতেব পূর্বে ও পশ্চিমে যে কোনও সময় ঝাঁপিয়ে পড়াব মত শক্র পাকিস্তানকে জীইয়ে রাখতে চায়।

সেই চেষ্টা ব্যর্থ হলে মারকিন যুক্তরাষ্ট্র কী করবে? তাবা নিশ্চয়ই ভারতের অগ্রগতিতে এবং শক্তি সঞ্চয়েব চেষ্টায় বাধা দেওয়ার সব পাবিকল্পনা বাতিল করবে না। তাবা অন্য বহুভাবেই সেই চেষ্টা চালিয়ে যাবে। যেমন এখনও চালাচ্ছে।

অন্যান্য কী কী ভাবে তাবা চেষ্টা করছে সে আলোচনা ভিন্ন। আপাতত আলোচ্য বিষয় পাকিস্তান ও বাংলাদেশ। বাংলাদেশে যখন স্বাধীন সরকাব পুরোপুরি কায়েম হবে, তখন মাবকিন যুক্তরাষ্ট্র তার পরিকল্পনাটা পাল্টাবে। প্রথমত, তারা চেষ্টা করবে, যাতে বাংলাদেশ সরকাবেব সঙ্গে ভারত সরকাবেব ঝগড়া লাগিয়ে দেওয়া যায়। দ্বিতীয়ত, তারা চেষ্টা কববে যাতে পশ্চিম পাকিস্তানকে বাঁচিয়ে রাখা যায় এবং আবার তাকে সামবিকভাবে শক্তিশালী করে তোলা যায়।

এখন থেকেই মাবকিন যুক্তরাষ্ট্র সেই চেষ্টা শুরু করছে। তারা কিভাবে কী চেষ্টা করছে আপাতত সে আলোচনা থাক। আপাতত শুধু আমি একটা কথা বলতে চাই। যদি আমাদেব সরকাবী কর্তা-ব্যক্তিরা এবং বাংলাদেশ সরকারের সবাই এখন থেকেই সতর্ক না হন তাহলে এ ব্যাপারে মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের আংশিক সাফল্য কেউ

আটকাতে পারবে না। তারা এখনই ভারত-বাংলাদেশ বিরোধের বীজ বপন করতে চাইছে। এ বীজ যদি একবার তারা পুঁতে ফেলতে পারে তাহলে ভবিষ্যতে কোনও না কোনও দিন গাছ জন্মাবেই।

তাই এখন থেকেই এ ব্যাপারে আমাদের সকলের—ভারতের এবং বাংলাদেশের সতর্ক হতে হবে।

আর চীন পাকিস্তানের সমর্থক কারণ সে ভারত বিরোধী। শত্রুর শত্রু আমার মিত্র এবং শত্রুর মিত্রও আমার শত্রু এইটাই এ ক্ষেত্রে চীনের প্রধান ইজম। সেই মূলমন্ত্রকে ভিত্তি করেই চীন বাংলাদেশেরও বিরোধী।

আমারও একটা জিনিস এই সঙ্গে বলতে চাই। স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরই সেখানে নানা বিদেশী শক্তির প্রচণ্ড খেলা শুরু হয়ে যাবে। সেই খেলা তারা চালাতে চাইবে বাংলাদেশের নেতা, অফিসার, জনতা সকলেরই মাধ্যমে। তাই এখন থেকেই বাংলাদেশ সরকারকে এই বিষয়ে সচেতন হতে হবে। এখন থেকেই তাদের শক্ত হাতে হাল ধরতে হবে। সাড়ে সাত কোটি মনুষের জন্য যদি তাঁরা একটা সুষ্ঠু জনকল্যাণমূলক প্রশাসন গড়ে না তুলতে পারেন তাহলে চার পাঁচ বছরের মধ্যেই বাংলাদেশে নানা গণ্ডগোল দানা বেঁধে উঠবে।

বাংলাদেশের সর্বত্র এখন প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ছড়িয়ে রয়েছে। এইসব অস্ত্রশস্ত্র সরকারের হাতে তুলে নেওয়া বাংলাদেশ সরকারের আর একটা বড় দায়িত্ব।

আর সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হল বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের হিত-সাধন—বাংলাদেশে সত্যিকারের জনকল্যাণমূলক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা।

এর কোনও কাজই সহজ নয়। বাংলাদেশ সরকার যদি এখনই কাজে না নেমে পড়েন তাহলে আর কোনও দিন হাল ধরার সুযোগ পাবেন কিনা বলা কঠিন হবে।

বাংলাদেশকে স্বীকৃতির পরে

শংকর ঘোষ

ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার সময় পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়া খান বড়াই করে বলেছেন, এই যুদ্ধই হবে ভারত-পাকিস্তানের শেষ যুদ্ধ। যুযুৎসু রাষ্ট্রনায়কদের মুখে এ কথা নতুন নয়। কিন্তু তাঁদের কেউই প্রতিশ্রুতি রাখতে পারেননি; এই যুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা আর একটি যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করেছেন।

ইয়াহিয়া খানের স্তোকবাক্যকেও উড়িয়ে দেওয়া চলত। যে-অর্থে তিনি এই আশ্বাস দিয়েছেন, সেই অর্থে তা সফল হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। বর্তমান যুদ্ধে ভারতের মত বিরাট দেশ সর্বকালের জন্য এমন শক্তিহীন হয়ে পড়বে যার ফলে আর কোনদিন সে পাকিস্তানের সঙ্গে শক্তিপরীক্ষায় সম্মত হবে না, এ বিশ্বাস সম্ভবত স্বয়ং ইয়াহিয়া খানেরও নেই। ভারত আগ্রাসক নয়, কাজেই ভারতের পাকিস্তান বা অন্য কোন দেশকে আক্রমণ করার প্রশ্নই ওঠে না। পাকিস্তান যদি ভারত আক্রমণ না করত তাহলে ইয়াহিয়া খানকে ভারত-পাকিস্তানের এই তথাকথিত শেষ যুদ্ধও লড়তে হত না। পাকিস্তান সরকার যতদিন ভারতবিদ্বেষকে তাঁদের মূলনীতি গণ্য করবেন, ততদিন ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সম্ভাবনা দূর হবে না।

ভারতীয় মাত্রেই বিশ্বাস করেন, এই যুদ্ধে জয় তাঁদের হবেই। যশোর দখলের পর এই বিশ্বাস নিশ্চয় দৃঢ়তর হবে।

বাংলাদেশে মুক্তিবাহিনী ও তাদের সহায়ক ভারতীয় সেনাবাহিনীর অগ্রগতি এমনই অপ্রতিহত যে, হয়ত এই লেখা বেরুনোর আগেই এই রণাঙ্গনের যুদ্ধ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যাবে। তাহলেও

এ-যুদ্ধের পরিণতি কী হবে তা নিশ্চিতভাবে বলার সময় এখনও আসেনি।

তবে ইয়াহিয়া খান যে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের দায়ে পড়বেন না সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নেই। এটাই ভারত ও পাকিস্তানের শেষ যুদ্ধ, কারণ যে পাকিস্তানের সঙ্গে পৃথিবী গত চব্বিশ বছর ধরে পরিচিত, সে-পাকিস্তান অবলুপ্তির পথে। তার ভৌগোলিক পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। এই যুদ্ধের শেষে পশ্চিম পাকিস্তান কী চেহারা নেবে তার উপর জল্পনার অবকাশ আছে; এই যুদ্ধের সামগ্রিক পরিণতির উপর তা অনেকাংশে নির্ভর করছে। কিন্তু অতীতের পূর্ব পাকিস্তান ও বর্তমানের বাংলাদেশ সম্পর্কে আর কোন অনিশ্চয়তা নেই।

আট মাসের সামরিক অত্যাচার সত্ত্বেও ইয়াহিয়া খান বাংলা দেশের মুক্তিযোদ্ধাদের দমন করতে সক্ষম হননি; বরং এই আট মাসে তাঁরা আরও শক্তি-সঞ্চয় করেছেন। যেখানে পাকিস্তান তার পূর্ণশক্তি প্রয়োগ সত্ত্বেও সফল হয়নি, সেখানে ভারতের সঙ্গে যুদ্ধরত পাকিস্তান খণ্ডিত শক্তির দ্বারা জয়লাভ করতে পারে না। বাংলাদেশে পাকিস্তানের এই সম্ভাব্য পরাজয় অবশ্যম্ভাবী হয়েছে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারকে ভারত সরকার স্বীকৃতি দেওয়ার পর। এই স্বীকৃতির ফলে মুক্তিবাহিনীর ভারতের কাছ থেকে সবরকম সাহায্য পাওয়ার কোন বাধা থাকল না। সে-সাহায্য যে অবিলম্বে পৌঁছেছে তার প্রমাণ স্বীকৃতির আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে পূর্ব রণাঙ্গণে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর বিপর্যয়ের পর বিপর্যয়।

বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার গঠনের সঙ্গে সঙ্গে সে-সরকারকে মেনে নেওয়ার দাবি ভারতের সমস্ত রাজনৈতিক দল থেকে তোলা হয়েছিল। সংসদে প্রধানমন্ত্রীর যে-প্রস্তাব গৃহীত হয় তাতেও বাংলা-দেশের মুক্তিযোদ্ধাদের সবরকম সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। এই প্রতিশ্রুতির অর্থ অস্থায়ী সরকারকে মেনে নেওয়া—একথা অনেকেই বার বার বলেছেন। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকেও

কয়েকবার স্বীকৃতির জন্য ভারত সরকারের কাছে আবেদন জানানো হয়।

তা সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী এতদিন এই দাবি পূরণ করেননি। তিনি অবশ্য কোনোদিনই স্বীকৃতি দানের বিরোধিতা করেননি। স্বীকৃতির ঔচিত্য সম্বন্ধে কোনদিনই তাঁর সংশয় ছিল না, ছিল স্বীকৃতির সময় সম্পর্কে। তিনি বলেছিলেন, স্বীকৃতির সময় তখনই আসবে যখন স্বীকৃতি দেওয়ার ফলে বাংলাদেশের জনসাধারণের কোন ক্ষতি হবে না।

স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে পারে, গত আট মাসে প্রধানমন্ত্রীর মতে যে সময় আসেনি আজ হঠাৎ কী করে সে সময় উপস্থিত হল। তার একটি কারণ ভারতের উপর পাকিস্তানের অতর্কিত ব্যাপক আক্রমণ। যতদিন পাকিস্তানী আগ্রাসন ছোটখাট সীমান্ত সংঘর্ষ ও ইয়াহিয়া-ভূট্টোর বিষোদ্গারের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, ততদিন প্রধানমন্ত্রী আপস আলোচনার মাধ্যমে বাংলাদেশ সমস্যার সমাধান সম্ভব মনে করেছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন পাকিস্তান সরকার মুখে যাই বলুন না কেন, তাঁরা ক্রমে বুঝবেন, সামরিক শক্তি দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকে খর্ব করা যাবে না বা একটা অসামরিক পুতুল-সরকার গঠন করে শান্তি ফিরিয়ে আনা যাবে না। সুতরাং আপাত অনমনীয়তা সত্ত্বেও পাকিস্তান সরকার একদিন বাংলাদেশের প্রকৃত প্রতিনিধি ও তাঁদের নেতা, শেখ মুজিবর রহমানের সঙ্গে আপস আলোচনায় প্রবৃত্ত হবেন। প্রধানমন্ত্রী যতদিন মনে করেছিলেন, এই সম্ভাবনা আছে, ততদিন তিনি বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়া স্থগিত রেখেছিলেন। কারণ স্বীকৃতির অর্থ পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষে রায় দেওয়া, তারপর ভারত সরকার পূর্ণ স্বাধীনতা ছাড়া অন্য কোন সমাধানে সম্মত হওয়ার পরামর্শ বাংলাদেশের নেতাদের দিতে পারতেন না।

ভারত আক্রমণ করে ইয়াহিয়া খান চূড়ান্তভাবে জানিয়ে দিলেন,

বাংলাদেশের প্রকৃত প্রতিনিধিদের সঙ্গে কোন রকম আলোচনা তিনি করবেন না। বাংলাদেশ সমস্যার শুরু থেকেই তিনি তাঁর মুরুব্বী দেশগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ রেখে এসেছেন এবং তাঁর ভারত আক্রমণের পরিকল্পনাও তাঁদের অজানা থাকার কথা নয়। তাঁদেরই পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি এখন আবার একটি মেকি অসামরিক সরকার গঠন করতে চলেছেন। কাজেই এই সব দেশগুলি যে চাপ দিয়ে ইয়াহিয়া খানকে সংযত করবেন তারও আর কোন সম্ভাবনা যুদ্ধ ঘোষণার পর রইল না। আপস মীমাংসার সমস্ত পথ রুদ্ধ হওয়ার পরই ভারত সরকার বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকার করে নিয়েছেন।

স্বীকৃতি দেওয়ার আরও একটি কারণ আছে। ভারতের উপর ব্যাপক আক্রমণ করার বেশ কয়েক দিন আগে থেকেই ইয়াহিয়া খান ও ভুট্টো বলতে শুরু করেছিলেন, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে অঘোষিত যুদ্ধ চলছে। এই অঘোষিত যুদ্ধের জন্য তাঁরা ভারত সরকারকে দায়ী করে রেখেছিলেন এবং পাকিস্তানী আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা বললেন, তাঁরা যা করছেন তা আক্রমণ নয়, প্রতিআক্রমণ।

নিরাপত্তা পরিষদের বিতর্কে দেখা গেছে, পাকিস্তানের মিথ্যা প্রচারে বিশ্বাস করার জন্য ব্যগ্র দেশের অভাব নেই। আমেরিকা ও চীন সরাসরি ভারতকে আক্রমণকারী বলে ঘোষণা করেছে। এই আক্রমণের কী উদ্দেশ্য তা এই দুই দেশের প্রতিনিধিরা স্পষ্ট বলেননি। তবে নিরাপত্তা পরিষদে তাঁরা যে-মনোভাব দেখিয়েছেন, তাতে তাঁরা যে কিছু দিনের মধ্যেই বলতে শুরু করতেন যে, বাংলাদেশকে গ্রাস করাই ভারতের উদ্দেশ্য, তাতেও কোন সন্দেহ নেই। বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারকে স্বীকার করে ভারত সরকার এই অপপ্রচারের পথ বন্ধ করেছেন। তাঁরা জানিয়ে দিয়েছেন, পাকিস্তানী আক্রমণের ফলে যে-যুদ্ধে তাঁরা লিপ্ত হতে বাধ্য হয়েছেন, তার উদ্দেশ্য পাকিস্তানের কোন অংশ গ্রাস করা নয়। বাংলাদেশের মুক্তির পর বাংলাদেশের প্রকৃত প্রতিনিধিরাই সে রাজ্য পরিচালনার ভার নেবেন। ভারত

সরকার বরাবর বলেছেন, তাঁরা শুধু চান বাংলাদেশে এমন অবস্থার সৃষ্টি হোক, যাতে সে- দেশের এক কোটি শরণার্থী আবার সসম্মানে ও নিরাপদে স্বদেশে ফিরে যেতে পারে। তাঁরা এখনও তার বেশি কিছু চান না এবং তাঁদের বিশ্বাস স্বাধীন বাংলাদেশের সরকার হিসাবে যাঁদের স্বীকৃতি দেওয়া হল, তাঁরা রাষ্ট্র পরিচালনার ভার গ্রহণ করলে শরণার্থীরা সকলেই ফিরে যাবে। এককথায়, স্বীকৃতি দানের মধ্য দিয়ে ভারত এই অবাঞ্ছিত যুদ্ধে তার লক্ষ্য ঘোষণা করেছে।

এ যুদ্ধ কতদিন চলবে, সে-প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই উঠেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকেই দেখা গেছে, যেসব যুদ্ধে কোন বৃহৎ শক্তি প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করেনি, সে সব যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। তার অর্থ এই নয় যে, এসব যুদ্ধে অল্পদিনের মধ্যেই জয়পরাজয়ের চূড়ান্ত মীমাংসা হয়ে গেছে। বৃহৎ শক্তিগুলিই তাদের যুদ্ধ বন্ধ করতে বাধ্য করেছে যাতে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তারা নিজেরা এই সব যুদ্ধে জড়িয়ে না পড়ে। বৃহৎ শক্তিগুলি যদি যুদ্ধ করা স্থির করে তাহলে তারা স্থান কাল স্থির করে অগ্রসর হবে ; ছোটখাট দেশের বিবাদকে উপলক্ষ করে নিজেদের শক্তিক্ষয় করবে না।

ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধেও বৃহৎ শক্তিগুলির জড়িত হওয়ার সম্ভাবনা কম। প্রধানমন্ত্রী তো ঘোষণাই করেছেন, তাঁদের সে রকম কোন অভিপ্রায় নেই। সুতরাং এ যুদ্ধ যাতে শীঘ্র বন্ধ হয়, তার জন্য বৃহৎ শক্তিগুলি উদ্যোগী হবে। নিরাপত্তা পরিষদে ইতিমধ্যেই এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। সেখানে কোন মীমাংসার সূত্র আবিষ্কৃত না হওয়ায় রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদেও বিষয়টি উত্থাপিত হয়েছে। সাধারণ পরিষদে গৃহীত প্রস্তাবে যুদ্ধবিরতি হয়নি এবং এ সম্পর্কে আবার চেষ্টা শুরু হয়েছে। যতদিন মীমাংসার সূত্র উদ্ভাবিত না হয় ততদিনই মাত্র এই যুদ্ধ চলবে। রণক্ষেত্রে এই যুদ্ধের মীমাংসা হবে মনে হয় না।

বাংলাদেশ ও ভারত দুয়ের পক্ষেই আগামী কয়েকদিন খুব গুরুত্বের। রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে যুদ্ধবিরতির যে-প্রস্তাব বিপুল

ভোটাধিক্যে গৃহীত হয়েছে তা ভারত সরকার সঙ্গত কারণেই অগ্রাহ্য করেছেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানের প্রধান প্রতিপক্ষ যে বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী তা পাকিস্তানের মুরুব্বীরা স্বীকার করতে রাজী নন বলে পাকিস্তানী সুরে সুর মিলিয়ে তাঁরা বলেছেন, ভারত ও পাকিস্তান তাদের সেনাবাহিনী অপসারণ করলেই শান্তিভঙ্গের আশংকা দূর হবে। বাংলাদেশের প্রকৃত প্রতিনিধিদের সঙ্গে পাকিস্তানী নেতারা ইতিপূর্বে আলোচনায় সম্মত হলে যেমন এই যুদ্ধ বাধত না, তেমনি এখনও যদি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবর রহমানের মুক্তি ও পাকিস্তান ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে আপস আলোচনার সুপারিশ করে কোন প্রস্তাব রাষ্ট্রপুঞ্জ গ্রহণ করে ও পাকিস্তান সরকারকে সেই প্রস্তাবে রাজী করাতে পারে, তাহলে যুদ্ধবিরতি হতে পারে।

পাকিস্তানের মুরুব্বীরা যখন বুঝবেন এই পথের বিকল্প নেই, তখন হয়ত তাঁরা পাকিস্তানের চৈতন্য উদয়ের জন্য উদ্যোগী হবেন। অন্যথায় স্বয়ং রাষ্ট্রপুঞ্জকেই রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতে হবে, যেমন দুই দশক আগে কোরিয়ায় হতে হয়েছিল। বর্তমান অবস্থায় এই রকম কোন চাল সফল হওয়ার সম্ভাবনা নেই। কাজেই রাষ্ট্রপুঞ্জ যে কদিন ভারত, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের গ্রাহ্য কোন প্রস্তাব উদ্ভাবন করতে না পারছে, তার মধ্যে গোটা বাংলাদেশ অথবা বাংলাদেশের যতখানি সম্ভব মুক্ত করতে হবে। যুদ্ধবিরতি হবে তৎকালীন সৈন্য সমাবেশের ভিত্তিতে ঃ সুতরাং যুদ্ধবিরতির প্রাক্কালে বাংলাদেশের যতখানি মুক্ত হবে স্বাধীন বাংলাদেশের আয়তন তার চেয়ে কম হবে না। যে দুর্বার গতিতে ভারত ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ নেতৃত্বে মুক্তিসেনারা এলাকার পর এলাকা মুক্ত করে আজ ঢাকার প্রান্তে পৌঁছেছেন, তাতে মনে হয় রাষ্ট্রপুঞ্জে পরবর্তী পদক্ষেপের আগেই সারা বাংলাদেশ মুক্ত হবে এবং সেদিনের পূর্ব পাকিস্তান জাতিসভায় বাংলাদেশ নামে ও পৃথিবীর নবতম স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করবে।

এই যুদ্ধ শেষ যুদ্ধ

নিখিল সরকার

এই যুদ্ধ ভারতের সঙ্গে আমাদের শেষ যুদ্ধ—হুংকার দিয়েছেন রণোন্মাদ ইয়াহিয়া খান। —তবে তা-ই হোক, উত্তর দিয়েছে ভারত। পাকিস্তানের অতর্কিত বিমান হামলার জবাব দিতে ভারতীয় বিমান বাহিনী পরক্ষণেই হানা দিয়েছে শত্রুর ঘাঁটিগুলোতে। বিমানের সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে গেছে নৌ আর স্থলবাহিনীও। এই উপমহাদেশ আজ এক সর্বাত্মক লড়াইয়ে মত্ত। পাকিস্তানের সঙ্গে এই যুদ্ধই কি আমাদের শেষ যুদ্ধ? বলা শক্ত। তবে দুটি সিদ্ধান্ত বোধহয় এক্ষুনি টানা যেতে পারে। এক—এই যুদ্ধ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সাফল্যের শীর্ষে নিয়ে যেতে বাধ্য। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ ইতিমধ্যেই বাস্তব অস্তিত্ব বিশ্বের মানচিত্রে রক্তের অক্ষরে লেখা হয়ে গেছে তার নাম। দ্বিতীয় সত্য এই, এই যুদ্ধ পুরনো পাকিস্তানকে মৃত বলে ঘোষণা করেই ক্ষান্ত হয়নি, বাংলার মাটিতে তাকে চিরকালের মত কবরস্থ করল। তার পরও হয়তো পশ্চিম পাকিস্তান কোনও একদিন যুদ্ধ ঘোষণা করবে ভারতের বিরুদ্ধে, কিন্তু সেসব অনাগত ভবিষ্যতের কথা। আজকের কথা—ইয়াহিয়ার জীবনে এই যুদ্ধ অবশ্যই ভারতের বিরুদ্ধে শেষ যুদ্ধ। কয়েক দশক আগে আর এক উন্মাদ হিটলারও ঘোষণা করেছিলেন—শেষ যুদ্ধের বাসনায় কথা। তার পরিণতি আমরা জানি। ভারত পাকিস্তান যুদ্ধের গতি ইঙ্গিতে বলছে একই পরিণতি অপেক্ষা করে আছে ইয়াহিয়ার জন্যও। খান. সাহেব যতদিন বেঁচে থাকবেন, এই যুদ্ধ তাঁর কাছে দুঃস্বপ্ন হয়ে থাকবে। বিভীষিকাময় স্মৃতি।

ইয়াহিয়া তবু যুদ্ধই চেয়েছেন। শান্তি তাঁর কাছে বর্জনীয়। দীর্ঘ আট মাস সময় পেয়েছিলেন তিনি, কিন্তু সে সময়টুকু শান্তির সন্ধানে খরচ করতে রাজী হননি, তাঁর সব উত্তম, সব উদ্যোগ যুদ্ধের জন্য। সর্বাত্মক যুদ্ধ। জেনারেলের আর এক সহযোগী জনাব ভুট্টোরও সব উৎসাহ ব্যয়িত হয়েছে এই লক্ষ্যে—যুদ্ধ চাই, সর্বাত্মক যুদ্ধ। ইয়াহিয়া বার বার বলেছেন—এবার যুদ্ধ হলে সে যুদ্ধ হবে সর্বাত্মক। যাকে বলে—টোটাল ওয়ার। ভুট্টো লিখেছেন—সেটাই যুক্তিসম্মত। আমাদের কালের সব যুদ্ধই সর্বাত্মক। ইউরোপীয় প্রতিরক্ষা ধারণার মূলেও সর্বাত্মক লড়াইয়ের চিন্তা। পাকিস্তানের কোনও অধিকার নেই খণ্ডযুদ্ধের চিন্তা করে দেশকে বিপন্ন করার। ভুট্টো আর ইয়াহিয়া দুইজন আলাদা মানুষ বটে কিন্তু মূলত তাঁরা একই সত্তা। জেনারেলের সদরের মুখ ভুট্টো, ভুট্টোর সামবিক মুখ জেনারেল। দুই-ই এক। দুই-ই পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক-বাণিজ্যিক-আমলা-তান্ত্রিক চক্রের প্রতীক মাত্র।

কেন ওঁরা ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন, জুয়া খেলায় কেন এই প্রকাণ্ড 'দান' ধরলেন, সেসব কথা পরে। আপাতত যুদ্ধের কথাই হোক। পাকিস্তান এর আগে ভারতের বিরুদ্ধে সরাসরি লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছে দুইবার। একবার দেশ বিভাগের অব্যবহিত পরেই কাশ্মীরে। আর একবার ১৯৬৫ সনের সেপ্টেম্বরে। দুইবারই আক্রমণের মুহূর্তে ভারত ছিল অপ্রস্তুত। তবে এই প্রস্তুতিহীনতা অবশ্য এক স্তরে ছিল না। '৬৫ সনের সেপ্টেম্বরে কাশ্মীর দখলের চেষ্টায় নামবার আগে এপ্রিলে কচ্ছের রাণে আচমকা হামলা চালিয়ে পাকিস্তান ভারতকে ইঙ্গিতে জানিয়ে দিয়েছিল—ভারত আক্রমণের সাহস এবং সাধ দুই-ই তার আছে। তাছাড়া প্রথম এবং দ্বিতীয়বারের পাকিস্তানী হামলার মধ্যে যে গতি সেখানে আরও একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল। ১৯৬২ সনে চীনের সঙ্গে লড়াই। ফলে আমাদের প্রতিরক্ষা চিন্তায় যুগান্তকারী পরিবর্তন।

সুতরাং প্রথমবারের হামলায় পাকিস্তান যদিও আন্তর্জাতিক চক্রান্তের সুযোগে একফালি কাশ্মীর হাতে পায়, দ্বিতীয়বার তাকে শূন্য হাতেই ফিরতে হয়েছে। বলা চলে—ক্ষতবিক্ষত হাতে ক্ষত চাটতে চাটতে। তাছাড়া '৬৫ সনের যুদ্ধে আরও কিছু নগদ লোকসান হয়েছে পাক জঙ্গীশাহীর। (এক) পাঁচজন ভারতীয় সৈন্য সমান একজন পাকিস্তানী সৈন্য এই উপকথার মৃত্যু হয়েছে। (দুই) পূর্ববাংলা জেনেছে সে পাকিস্তানের কে এবং পাকিস্তান যাঁদের হাতে তারাই বা কারা। মনে রাখা চাই, মুজিবুর [illegible] আওয়ামি লীগের ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবিপত্র যুদ্ধের অব্যবহিত পরে বসে লেখা। এক কথায় '৬৫-র যুদ্ধের পর পাকিস্তানের সামরিক রাজনৈতিক চরিত্র সম্পূর্ণ নগ্ন।

এবার শুরু হয়েছে তৃতীয় যুদ্ধ। এই যুদ্ধ কী চেহারা নেবে পাকিস্তান আগেভাগেই তা জানিয়ে রেখেছে। জবাব ভুট্টো একদা ভারতের বিরুদ্ধে হাজার বছর লড়াই চালিয়ে যাওয়ার সংকল্প ঘোষণা করেছিলেন। চীন থেকে ফিরে এসে তার সদম্ভ উক্তি—সিন্ধু আর গঙ্গার জল লালে লাল হয়ে যাবে। লড়াই হবে প্রতি ইঞ্চি জমির জন্য, লড়াই হবে প্রতি বাড়িতে প্রতিটি ঘরে। ভুট্টো মনে মনে স্তালিনগ্রাদের স্বপ্ন দেখছিলেন। কারণ আর কিছু নয়—ভুট্টো তার আগেই ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রীর সতর্কবাণীটি মনোযোগ দিয়ে শুনেছেন। শ্রীজগজীবন রাম বার বার হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন—পাকিস্তান যদি ভারত আক্রমণ করেন তবে ভারতীয় বাহিনী সে লড়াই নিয়ে যাবে পাকিস্তানের মাটিতে। ঠিক এ-ধরনের কথাই সেবার বলেছিলেন শাস্ত্রীজী। বলেছিলেন—আমরা লড়াই করব আমাদের পছন্দসই সময়ে, পছন্দমত জায়গায়—অ্যাট এ টাইম অ্যাণ্ড প্লেস অব আওয়ার চুজিং। ভারত এবার আর কোনও সামরিক-রাজনৈতিক বিতর্কের অবকাশ রাখেনি। আমাদের তরফ থকে আগেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে—সর্বাত্মক লড়াইয়ের বিরুদ্ধে ভারতের সাড়া হবে সর্বাত্মক।

'৬৫ সনের যুদ্ধ এক অর্থে সর্বাত্মক, অন্য অর্থে নয়। দুই বাহিনীই আন্তর্জাতিক সীমানা অতিক্রম করেছিল। যুদ্ধ তবু সর্বার্থে সর্বাত্মক নয়। সেদিন লাহোর বিমান বন্দরে উড়োজাহাজ নামাবার আগে আমেরিকাকে ভারতের অনুমতি নিতে হয়েছে বটে, কিন্তু প্রবল প্ররোচনা সত্ত্বেও ভারত পূর্ববাংলাকে লক্ষ্য করে একটি গোলাও নিক্ষেপ করেনি। বাংলাদেশ ছিল সে-যুদ্ধে সম্পূর্ণ অক্ষত, নিস্পৃহ দর্শক মাত্র। এবার প্রধান রণক্ষেত্র অন্তত ভারতের দৃষ্টিতে—বাংলাদেশ। প্রধান পরিবর্তন সেখানেই। ভারত সরকার জানিয়ে দিয়েছেন, এবারকার যুদ্ধে আমাদের মূল লক্ষ্য দুইটি। এক—বাংলাদেশ থেকে দখলকার পশ্চিম পাকিস্তানী বাহিনীকে উচ্ছেদ করে সাড়ে সাত কোটি বাঙালীর মুক্তি সাধন। দুই—পশ্চিম পাকিস্তানের সমর যন্ত্রকে চূর্ণ করা। পশ্চিম পাকিস্তানের জমির উপর ভারতের কোনও লোভ নেই। জমি দখল যদি এই মুহূর্তে করা হচ্ছে দেখা যায়, তবে বুঝতে হবে সে নিজেদের জমি রক্ষা করার জন্যই। মূল লক্ষ্য—শত্রুর বিষদাঁত ভেঙে দেওয়া।

প্রথম লক্ষ্য প্রায় পূর্ণ। বাংলাদেশ মুক্ত। ভুট্টো যে স্তালিনগ্রাদ স্বপ্নে দেখেছিলেন, বলা নিষ্প্রয়োজন, বাংলাদেশে সে মহান যুদ্ধের সঙ্গে তুলনীয় কোনও যুদ্ধের নজির যদি স্থাপিত হয়, তবে তা স্থাপন করবেন মুক্তিযোদ্ধারা আর তাঁদের সহযোদ্ধা ভারতীয় বাহিনী। বাংলাদেশের জনসাধারণ যে সেখানে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর জন্য বিশাল মৃত্যুশয্যা রচনা করে বসে আছেন, সে কথা তিনি জানতেন না? ইয়াহিয়া খানের নিজের হিসাব—দেড় লক্ষ বাঙালী আজ সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা। আরও কয়েক লক্ষ অস্ত্র ধারণের অপেক্ষায়। বিদেশী পর্যবেক্ষকরা ঘুরে এসে জানিয়েছেন—বাংলাদেশের ভেতরে প্রতিটি গ্রামে বন্দরে নগরে মুক্তিযোদ্ধাদের সহোদরেরা ওৎ পেতে বসে আছেন। আশি হাজার পাকিস্তানী সৈন্যের সাধ্য নেই সেই আগুন থেকে রক্ষা পায়। ভারতীয় বাহিনীর হস্তক্ষেপের পরে আজ তাদের

পালাবার পথও বন্ধ। একমাত্র পথ বাংলার সবুজ মাটিতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া, কিংবা আত্মসমর্পণ। অতি দ্রুতবেগে এগিয়ে আসছে শেষের সেদিন।

এই যুদ্ধে ভারতের নৈতিকতা প্রশ্নাতীত। অন্যের দেশে এক কোটি শরণার্থী ঠেলে দেওয়া এক ধরনের আক্রমণ। পাকিস্তান সেখানেই নিরস্ত হয়নি। পরক্ষণেই শুরু করেছে সীমান্তে গোলাবর্ষণ, তারপর সরাসরি—ব্যাপক আক্রমণ। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ তখন স্বভাবতই ভারতের আত্মরক্ষার যুদ্ধে পরিণত। ভারতীয় নেতৃত্বের পক্ষে এটা পরম গৌরবের কথা, ঐতিহাসিক মুহূর্তটিকে চিনে নিতে তাঁরা দ্বিধা করেননি। মুক্তিযুদ্ধের অধিকার যে-কোন অত্যাচারিত জনগোষ্ঠীর রয়েছে। আন্তর্জাতিক আইনেও (Bellum Justum) সে-অধিকার স্বীকৃত। এই যুদ্ধে নৈতিক সমর্থন নিয়ে কোনও প্রশ্নই ওঠে না। সশস্ত্র সমর্থনও ভারতের এক্তিয়ারে। কেননা, বাংলাদেশে যতক্ষণ হানাদার আছে, ততক্ষণ ভারতের নিরাপত্তা নেই, শরণার্থীদের ঘরে ফেরার কথা বলা যায় না—সঙ্কট যথা স্থানেই থেকে যায়। আর পাকিস্তানের প্রকাশ্য সার্বিক আক্রমণের পরে তো কথাই নেই। ভারতীয় বাহিনী আজ করাচির দিকে এগিয়ে গেলেও বলার কিছু নেই। সর্বাত্মক যুদ্ধ সব পথ ধরেই চলতে পারে।

পাকিস্তান কি এসব পরিণতির কথা ভেবেছিল? মনে হয় না। মনে হয় তার হিসাবে কোথাও ভুল ছিল। আরও অনেক দেশের মত পাকিস্তানী জঙ্গীতন্ত্রও বোধহয় ভেবেছিল—ভারত এতদূর এগুবে না। সর্বাত্মক যুদ্ধের কথা বললেও তার মনে বোধহয় আশা ছিল, ভারত খণ্ডযুদ্ধেই নিজেকে আবদ্ধ রাখবে। আর একান্তই যদি সর্বাত্মক লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়ে, তবে সে যুদ্ধ আর ক'দিন চলবে? পাকিস্তানের বন্ধু, পৃষ্ঠপোষক এবং পথ প্রদর্শকরা ছুটে আসবে, মুহূর্তে যুদ্ধবিরতি হয়ে যাবে। পাকিস্তান জেনে-শুনে এই বিরাট ঝুঁকি নিয়েছে, কারণ তার সামনে যুদ্ধ ছাড়া বোধহয় আর কোনও পথ খোলা ছিল না।

সে জানে—বাংলাদেশে দখল রাখা শক্ত। বাংলা মুলুক যদি ছেড়ে আসতেই হয়, তবে ভারতীয় বাহিনীর কাছে তা ছেড়ে আসা কি ইয়াহিয়ার পক্ষে অধিকতর সম্মানজনক নয়? পশ্চিম পাকিস্তানীদের কাছে কৈফিয়তটা তখন অনেকাংশে বিশ্বাসজনক [illegible]। আর, ইত্যবসরে বাংলার বদলে পাঞ্জাবীদের হাতে যদি পুরা কাশ্মীর তুলে দেওয়া সম্ভব হয়, তবে তো কথাই নেই। পাকিস্তানী জেনারেলরা নাকি বলে বেড়াচ্ছিলেন—বাংলা[illegible] হবে দিল্লির ময়দানে। পাকিস্তানের সামরিক লক্ষ্য—ভা[illegible]। অন্যতম রাজনৈতিক লক্ষ্য—আন্তর্জাতিক সংকট সৃষ্টি করে পাকিস্তানের অনুকূলে রায় আদায় করা।

সামরিক ব্যাপারে, সন্দেহ নেই, পাকিস্তান ইজরায়েলের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে চেয়েছে। ছয় দিনের [illegible]প্রদ লড়াইয়ে ইজরায়েল যে ভাবে আরবদের জব্দ করেছিল, হঠাৎ ভারতীয় ঘাঁটিগুলোয় বিমান আক্রমণ চালিয়ে পাকিস্তানও তাই করতে চেয়েছিল। ভুট্টো তাঁর 'দি মিথ অব ইনডিপেনডেন্স' বইয়ে ইজরায়েলকে তুলনা করেছেন ভারতের সঙ্গে। কিন্তু মগজে তিনি পাকিস্তানের জন্য যে সামরিক কৌশল সুপারিশ করেছেন, তাতে আচমকা বিমান আক্রমণ, হঠাৎ শত্রুর জমি দখল করে সেখানে চুপচাপ বসে থাকা—এসব অবশ্য কর্তব্য বলে চিহ্নিত। পাকিস্তান তাই করতে চেয়েছিল।

কিন্তু সেটা যে আগুন নিয়ে খেলা জঙ্গীশাহী এতক্ষণে নিশ্চয় সেটা বুঝতে পেরেছে। আজ আর তার ফেরার উপায় নেই। বাংলাদেশে তার চূড়ান্ত পরাজয় অবধারিত। যুদ্ধে অপ্রত্যাশিতের জন্য একটা এলাকা নাকি ধরে রাখা হয়। তা রেখেই আজ নির্দ্বিধায় বলা চলে,—পশ্চিম সীমান্তেও পাকিস্তানকে সান্ত্বনা দেওয়ার মত কোনও ঠাঁই মিলছে না। পাকিস্তান পর্যুদস্ত হতে বাধ্য। এই যুদ্ধ অবশ্যই ইয়াহিয়া খাঁর শেষ যুদ্ধ। সম্ভবত জনাব ভুট্টোরও। আর

ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জিগীর যদি না থাকে, তবে পাকিস্তানের এই জঙ্গীতন্ত্রই [illegible] থাকবে? 'ভারতকে ধ্বংস কর' এই শ্লোগান গত পঁচিশ ব[illegible]রে যে রাষ্ট্রের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস, তা যদি বন্ধ হয়ে যায়, খ[illegible] পাকিস্তানের ভিতও কি তবে চৌচির হয়ে যাবে না? এই যুদ্ধ শুধু ইয়াহিয়া খানের শেষ যুদ্ধ সম্ভবত পাকিস্তানেরও শেষ যুদ্ধ।

ঢাকার লড়াই, অতীতের পৃষ্ঠা থেকে

আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী

প্রাচীন হিন্দু ও পাঠান আম[illegible]র হয়ত অস্তিত্ব ছিল, কিন্তু শহর বা নগরীর মর্যাদা ছিল [illegible] ভূঞাদের যুগ পর্যন্ত বাঙলাদেশের বিভিন্ন অঙ্গ রাজ্যের [illegible]জধানী কখনো গৌড়, কখনও সুবর্ণগ্রাম প্রভৃতি স্থানে ছিল। কিম্বদন্তী প্রচলিত, সম্রাট আকবরের সময়ে ঢাকা নগরীর প্রকৃত উৎপত্তি এবং বাঙলাদেশে মোগল-শাসন দৃঢ় করার জন্য সম্রাট [illegible]রের সেনাপতি ইসলাম খাঁ প্রথম নদীপথে অভিযান চালিয়ে ঢাকা শহর অবরোধ করেন। তিনি শীতলক্ষ্যা নদীর পারে নারায়ণগঞ্জ বন্দরের অদূরে পাগলায় প্রথম পা দেন এবং সেখানে একটি দুর্গ তৈরি করেন। এই পাগলা-দুর্গের ভগ্নাবশেষ এখনও রয়েছে। ইসলাম খাঁ ঢাকায় 'সুবে বাঙলার' রাজধানী স্থাপন করেন এবং নিজে প্রথম মোগল গবরনর নিযুক্ত হন্।

ঢাকা রেসকোরসের মাঠে যে প্রাচীন কালী মন্দিরটি এবার পাকিস্তানী খানসেনারা ধ্বংস করেছে, তার প্রাচীন রেকরডপত্র থেকে দেখা যায়, এই মন্দিরটির বয়স সাতশো বছরেরও বেশী। ঢাকা শহরের চাইতেও এই মন্দিরটি প্রাচীন। মোগল আগ্রাসন রোখার জন্য ঈশা খাঁ এই মন্দিরে বসে বাঙলার হিন্দু ভূঞাদের সঙ্গে যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তিতে স্বাক্ষর দিয়েছিলেন। বৃটিশ আমলে স্বদেশী বিপ্লবীরা এই কালীমন্দিরে ঢুকে বিপ্লবী শপথবাক্য পাঠ করতেন ও দীক্ষা নিতেন।

ঢাকা শহর এইবারই যে প্রথম বা দ্বিতীয়বার অবরুদ্ধ হয়েছে, তা নয়। বাঙলাদেশে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব যতবার হাত বদল হয়েছে, ততবারই কখনো যুদ্ধের, আবার কখনো গৃহযুদ্ধের আগুন জ্বলেছে

ঢাকায়। ঢাকার হাতবদল ভাগ্য নির্ধারণ করছে অবশিষ্ট বাঙলার। তবে অন্যান্যবারের যুদ্ধের সঙ্গে এবারের যুদ্ধের পার্থক্য, প্রতিবার ঢাকা অবরুদ্ধ হয়েছে দখলদার বাহিনীর হাতে। এবারের যুদ্ধে ঢাকা মুক্ত হতে চলেছে নিজ দেশের মুক্তিসেনা ও তার মিত্রবাহিনীর হাতে। এবার ঢাকা বিজয়ী বিদেশী শাসকের প্রাদেশিক রাজধানী হবে না, হচ্ছে মুক্ত জনগণের কেন্দ্রীয় শাসনের প্রধান কেন্দ্র।

মোগল-যুগে সম্রাট [illegible]র আমলেই ঢাকা দ্বিতীয়বারের জন্য অবরুদ্ধ হয় তাঁর বি[illegible]ত্র খুররম বা শাহজাহানের দ্বারা। শাহ্‌জাহান ঢাকা অবরোধ করে রেখেছিলেন প্রায় সাতদিন। তিনি গবরনর ইব্রাহিম খাঁকে যুদ্ধে পরাস্ত ও নিহত করেন এবং প্রচুর অর্থ লুণ্ঠন করে সিরাজগঞ্জের পথে ঢাকা ত্যাগ করেন। শাহ্‌জাহানের পত্নী মমতাজ বেগম ঢাকার যে এলাকায় কিছুদিন অবস্থান করেছিলেন, সে এলাকাটির নাম এখনও বেগমবাজার। শাহ্‌জাহানের পুত্র শাহ্‌ সুজা দিল্লির কর্তৃত্ব অস্বীকার করে ঢাকাকেই তাঁর অস্থায়ী রাজধানী করেছিলেন এবং বুড়িগঙ্গা নদীর পারে তাঁর বড়কাটরা দুর্গ তৈরী করেছিলেন। ভ্রাতাদের সঙ্গে গৃহযুদ্ধে পরাজিত হয়ে তিনি সপরিবারে ঢাকা থেকে আরাকানের পথে পালিয়ে যান এবং নিহত হন। ঢাকার শেষ মোগল গবরনর সম্রাট ঔরঙ্গজীবের পুত্র আজিমুশশান। তাঁরই নামে ঢাকার একটি এলাকার নাম আজিমপুর। এই সময় মুরশিদ কুলি খাঁ ছিলেন বাঙলাদেশে দিল্লির রাজস্ব আদায়ের ভারপ্রাপ্ত অফিসার। তাঁর সঙ্গে গবরনর আজিমুশশানের তীব্র ব্যক্তিগত বিরোধ দেখা দেয় এবং ঢাকার রাজপথে মুরশিদ কুলি খাঁ আততায়ীর অস্ত্রাঘাত থেকে অল্পের জন্য বেঁচে যান। ফলে তিনি বাঙলার রাজস্ব সংক্রান্ত হেডকোয়ারটার মকসুদাবাদে স্থানান্তর করেন এবং আজিমুশশানের পর বাংলার গবরনর নিযুক্ত হয়ে ঢাকা থেকে মকসুদাবাদে রাজধানী স্থানান্তর করেন। মকসুদাবাদের নাম রাখা হয় মুরশিদাবাদ।

নবাব আলিবর্দি নবাব সিরাজউদ্দৌল্লার আমলে মুরশিদাবাদ যখন কার্যত দিল্লীর কর্তৃত্ব-মুক্ত, তখন ঢাকা ছিল বাঙলাদেশের উপ-রাজধানী। ডেপুটি গবরনর নিযুক্ত হয়েছিলেন ঢাকায়। আলিবর্দীর মৃত্যুর অবহিত পূর্বে সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে ঢাকা হয়ে উঠেছিল সিরাজ-সমর্থক ও সিরাজ-বিরোধীদের গৃহযুদ্ধের কেন্দ্র। এই গৃহযুদ্ধে সিরাজের বিরোধী দল থাকায় ঢাকার এক বৃদ্ধ ডেপুটি গবরনর নিহত হন সিরাজ সমর্থকদে[illegible]। অন্যদিকে আরেকজন সেনাপতি আগা বাকের খাঁ (বাখের[illegible]া যাঁর নামানুসারে) নিহত হন সিরাজ-বিরোধীদের হাতে। নবাব সিরাজউদ্দৌল্লার পতনের পর ইংরেজ আমলেও ঢাকার ডেপুটি গবরনরগণ কিছুকাল ক্ষমতাহারা ঢাকার নবাব নামে পরিচিত ছিলেন। এই বংশের শেষ নবাব কমরউদ্দৌল্লা। তিনি ভাল ইংরেজি জানতেন, সেকসপিয়র আবৃত্তি করতেন এবং পোষা পায়রার বিয়েতে ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে পাওয়া বৃত্তির লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করে ফেলতেন। কখনও প্রচুর মদ্যপান করে ইংরেজ মেম সেজে রাস্তায় বেরিয়ে লোক হাসাতেন। তাঁরই প্রধান পাচক কাশ্মীর থেকে আগত জনৈক খাজা এই নবাব পরিবারের প্রচুর ধনসম্পত্তির অধিকারী হন এবং এই খাজা বংশের জনৈক আবদুল গণি সিপাহী বিদ্রোহের সময় বৃটিশদের সহায়তা করে নবাব খেতাব পান এবং তাঁরই বংশধরেরা আজ পর্যন্ত ঢাকার নবাব নামে পরিচিত রয়েছেন। সিপাহী বিদ্রোহ থেকে শুরু করে ১৯৭১ সালের মারচ মাস পর্যন্ত এই উরদুভাষী খাজা পরিবার পুরুষানুক্রমে বাঙলাদেশ ও বাঙালীর স্বার্থের বিরোধিতা করে এসেছেন। এই পরিবারের খাজা সলিমুল্লার সহায়তায় বর্তমান শতকের গোড়ায় বৃটিশ শাসকেরা বঙ্গ ভঙ্গ করেন এবং কিছুদিনের জন্য ঢাকা নবগঠিত পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের রাজধানী হয়েছিল। এই পরিবারের খাজা নাজিমুদ্দিন ১৯৪১ সালে বাঙলাদেশের প্রধানমন্ত্রী পদের লোভে শেরে বাঙলা ফজলুল হককে মুসলিম লীগ থেকে বহিষ্কারের কাজে মিঃ জিন্নাকে

সহায়তা জোগান এবং ১৯৫১ সালে পাকিস্তানের গবরনর জেনারেল পদে থাকাকালে জিন্নার উক্তি মেনে নিয়ে ঘোষণা করেন, 'উরতুই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে।' তাঁর এই উক্তির পরই বাহান্ন সালের রক্তাক্ত ভাষা আন্দোলনের জন্ম। তিনি এই আন্দোলনকে 'ভারতীয় চক্রান্ত' আখ্যা দিয়েছিলেন। এই পরিবারের বর্তমান নবাব আসকারী আয়ুব-চক্রের প্রধান সহযোগী ও মোনেম খাঁর মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন। এই পরিবারের খাজা খায়েরুদ্দিন ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে মুশ[illegible]গের প্রার্থী হিসাবে শেখ মুজিবর রহমানের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন ও পরাজিত হন এবং ২৫শে মারচ তারিখের পর বাঙালী নিধনে জেনারেল টিক্কা খাঁর প্রধান সহযোগী হন। তাঁরই নেতৃত্বে ঢাকা শহরে পাকিস্তানী হানাদারদের সমর্থনে কিছু সংখ্যক লোক নিয়ে শোভাযাত্রা বের হয় এবং শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারীরা বাঙালীদের ঘরে ঘরে লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগের কাজে রত হয়। বর্তমানে খাজা খায়েরুদ্দীন বাঙলাদেশ থেকে পলাতক। পাণিপথের যুদ্ধ যেমন এককালে সারা ভারতবর্ষের ভাগ্য নির্ধারণ করেছে; ঢাকার যুদ্ধও তেমনি এককালে বাঙলাদেশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ ও নির্ধারণে বহুলভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। এবারের প্রায় বিনা লড়াইয়ে ভারতীয় জওয়ানের কাছে পাকফৌজের আত্মসমর্পণ এবং ঢাকার মুক্তি কয়েক শতাব্দীর পর শাসন ও অবমাননার ইতিহাসের শেষ অধ্যায়ে যবনিকা টেনেছে এবং স্বাধীন বাঙলাদেশের জন্মকে প্রতিষ্ঠিত সত্য হিসাবে দাঁড় করিয়েছে।

স্বাধীন বাংলার আবির্ভাবে এশিয়ায় শক্তিসাম্যের হেরফের

শংকর ঘোষ

ঐতিহাসিক ঘটনায় প্রত্যক্ষদর্শী [illegible]শীদার হওয়া সৌভাগ্যের সন্দেহ নেই, কিন্তু তার অন্য একটি দি[illegible] আছে। ঘটনার প্রতিঘাতে সমকালীনের অভিভূত হওয়াই স্বাভাবিক। তাঁর পক্ষে ঘটনার গুরুত্ব সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি সম্ভব নয়। গত মারচ মাসের শুরুতে শেখ মুজিবর রহমান যখন রমনা ময়দানে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন তখন-সেই ইতিহাস স্রষ্টা বা তাঁর লক্ষ লক্ষ শ্রোতার কেউই নিশ্চয় বুঝতে পারেননি এই ঘোষণার সাফল্য কোন পথে, কী রূপে, কতদিনে আসবে। তেমনি গত বৃহস্পতিবার সেই রমনা ময়দানেই পরাজিত পাকিস্তানী সেনানায়কের আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে যে-স্বাধীন বাংলাদেশের চূড়ান্ত আত্মপ্রকাশ ঘটল এই ভূখণ্ডে তার ভূমিকা কী হবে, ভবিষ্যতের বাংলাদেশ বর্তমানের অবিকল প্রতিফলন হবে কি না—এ সব প্রশ্নের উত্তরও এখনই সম্ভব নয়।

স্বাধীন বাংলাদেশের আবির্ভাবকে অনেকেই ঐতিহাসিক বলে বর্ণনা করেছেন। যে কোন দেশের স্বাধীনতা লাভই ঐতিহাসিক ঘটনা, অন্তত এই অর্থে যে, ইতিহাসে তার স্থান হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা একই অর্থে ঐতিহাসিক নয়, এমন কি বাংলাদেশের জনগণ যে-স্বাধীনতা পেলেন সেটিও প্রচলিত অর্থের স্বাধীনতা নয়। তাঁরা তো স্বাধীন ছিলেনই, যেদিন থেকে আমরা স্বাধীন সেদিন থেকেই। সেই স্বাধীনতার ফল তাঁরা কী পেয়েছেন, স্বাধীনতার ফলে দেশের উপর যে সার্বভৌম ক্ষমতা 'বর্তেছে তার প্রয়োগ দেশের নেতারা কী ভাবে করেছেন সে সব কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু মারচ মাসে যে-স্বাধীনতা

লাভের সঙ্কল্প রমনার মাঠে ঘোষিত হয়েছিল এবং বৃহস্পতিবার সেখানেই যে-স্বাধীনতার শেষ অন্তরায় দূর হল সে-স্বাধীনতা গত দশ বছরের গোটা চল্লিশ দেশের স্বাধীনতা থেকে ভিন্ন।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সম্ভবত সেজন্যই বাংলাদেশের সংগ্রামকে তার চূড়ান্ত পর্যায় মুক্তিসংগ্রাম বলে বর্ণনা করেছিলেন। উপনিবেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে অনেক সময় মুক্তিসংগ্রাম বলা হয় যদিও মুক্তিসংগ্রামের একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে—শ্রেণী সংগ্রামের সঙ্গে তার সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য কিন্তু যে সীমাবদ্ধ অর্থে বাংলাদেশের সংগ্রামকে মুক্তিসংগ্রাম বলা হয়েছিল সে-অর্থেও কি এটি মুক্তিসংগ্রাম?

যে-অর্থে ইংলনড বা ফ্রানস বা পরতুগাল ঔপনিবেশিক শক্তি ছিল বা আছে, সে-অর্থে সেদিনের পূর্ব পাকিস্তান নিশ্চয়ই পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশ ছিল না। পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা হরণ করেনি, বা অন্য দেশ জয়ের যৌতুক হিসাবে তাকে পায়নি। দুয়েরই জন্ম এক লগ্নে এবং এক রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্তি তাদের স্বেচ্ছা মিলন ছাড়া আর কিছু নয়।

যে-ঔপনিবেশিক শোষণের অবসানের জন্য বাংলাদেশের নেতারা দ্বিতীয়বার স্বাধীনতালাভের সঙ্কল্প নিয়েছিলেন সে-শোষণ পরবর্তী কালের। বাংলাদেশের সার্থক সংগ্রামে প্রমাণিত হল, একই রাষ্ট্রের অগ্রসর ও শক্তিশালী অংশ যদি অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও অনগ্রসর অংশকে নিজের বৈষয়িক উন্নতির জন্য ব্যবহার করতে বদ্ধপরিকর হয় তা হলে তার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম বিদ্রোহ।

পাকিস্তানে যে-সমস্যার পরিণতি বাংলাদেশ সে-সমস্যা অন্য রাষ্ট্রেও আছে। বিচক্ষণ রাষ্ট্রনায়ক মাত্রেই শুরুতে সে-সমস্যার সাবধানের চেষ্টা করেন যা পাকিস্তানের ক্ষেত্রে ঘটেনি। বাংলাদেশের সংগ্রামে সক্রিয় সহানুভূতি ও সাহায্যের জন্য যাঁরা ভারতকে দোষারোপ করছেন, বলছেন, শ্রীমতী গান্ধী একটি বিচ্ছিন্নতাকামী আন্দোলনকে জয়ী করে খাল কেটে কুমীর আনলেন তাঁরা মনে

রাখেন না যে, ভারত ও পাকিস্তানের নেতৃত্বের মধ্যে একটি বিরাট পার্থক্য আছে, তুলনায় অনগ্রসর ও দরিদ্র ভারতীয়রা একই ভাষা ও সংস্কৃতির বন্ধন আবদ্ধ নন বা এক রাজ্যের অধিবাসী নন। বাংলা-দেশের ভৌগোলিক অবস্থানও মুক্তি-আন্দোলনের একটি বড় কারণ। বাংলাদেশ যদি পশ্চিম পাকিস্তানের সংলগ্ন হত তা হলে আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি স্বাধীনতার দাবীতে পর্যবসিত হত কি না সন্দেহ।

যে সব রাষ্ট্র ভারতের সমালোচনায় মুখর তাঁদের অসন্তোষ বাংলাদেশের স্বাধীনতার ফলে পাকিস্তানের শক্তি হ্রাস বা দক্ষিণ এশিয়ার ভৌগোলিক পুনর্বিন্যাসের জন্য নয়। স্বাধীনতার শর্তস্বরূপ ভারতের দ্বিখণ্ডীকরণ তাঁদের উদ্ভাবন নয়। এবং সেই দুটি খণ্ডের একটি খণ্ড যদি আবার দ্বিখণ্ডিত হয় তা হলেও তাঁদের আপত্তি করার কথা নয়। পুরনো নথি-পত্র ঘাঁটলে হয়ত দেখা যাবে, এই সব দেশের নেতারই ১৯৪৭ সালে ইংলনডের সমালোচনা করেছিলেন, বলেছিলেন, ভারত বিভাগের মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ সরকার তার এই প্রাক্তন উপনিবেশটির চরম ক্ষতি করে গেলেন।

এইসব শক্তিরাই আজ যা বলছেন তাতে মনে হয়, ভারত বিভাগের মত মহৎ কাজ বৃটিশ সরকার আর করেননি। তার কারণ তাঁরা অভিজ্ঞতার দ্বারা বুঝেছেন, অখণ্ড ভারত স্বাধীন হলে দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কতকাংশে তার প্রভাব অপ্রতিহত হত। ভারত বিভাগের ফলে সে-সম্ভাবনা আংশিক দূর হয়েছিল, আরও দূর হল যখন পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর মনোভাবের ফলে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে চিরস্থায়ী শত্রুতার সম্পর্ক স্থাপিত হল। কাশ্মীর সমস্যায় সমস্ত পশ্চিমী শক্তিই পাকিস্তানের অনুকূলে রায় দিয়ে এসেছেন এবং কাশ্মীর সমস্যা যে দুই দশক পরেও নিরাপত্তা পরিষদে খাতাকলমে অমীমাংসিত থেকে গেছে তার অন্য কোন কারণ নেই। ঘটনাচক্রে যদি ভারত পাকিস্তান সম্পর্কের উন্নতির লক্ষণ দেখা যায় তাহলে এই পুরনো সমস্যার অবতারণা করে সেই প্রচেষ্টাকে

যাতে ব্যর্থ করা যায় তার জন্যই নিরাপত্তা পরিষদের অভিমতে কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ আজও অনিশ্চিত।

স্বাধীন বাংলাদেশের আবির্ভাবেও তাঁদের আপত্তি এইখানে। সেখানকার নেতারা ধর্মীয় ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠনে বিশ্বাসী নন। তাঁরা ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক, সমাজবাদী রাষ্ট্র গঠন করতে চান। সেদিক থেকে ভারতের সঙ্গে তাঁদের একাত্মবোধের সম্ভাবনা। গত নয় মাসে তাঁরা ভারত সরকার ও এদেশের জনসাধারণের কাছ থেকে যে সহানুভূতি ও সহযোগিতা পেয়েছেন এবং পক্ষকালের যুদ্ধের মধ্য দিয়ে দুই দেশের যে মৈত্রীবন্ধন গড়ে উঠেছে তার ফলে এই দুই স্বাধীন প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সহ-অস্তিত্ব সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতার অর্থ দক্ষিণ এশিয়ায় প্রায় পঁচিশ বছর যে শক্তিসাম্য বজায় ছিল তার অবসান। এই শক্তিসাম্য যাঁদের অনুকূল ছিল তাঁরা সকলেই বিষণ্ণ ও বিরক্ত। বাংলাদেশের স্বাধীনতায় তাঁদের যত না আপত্তি তার চেয়ে অনেক বেশী আপত্তি যে নেতৃত্বে স্বাধীনতা সম্ভব হয়েছে তাতে। স্বাধীন বাংলাদেশের নেতারা যদি পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকদের বাঙালী সংস্করণ হতেন তাহলে এত আপত্তি উঠত না, এমন কি তাঁরা যদি অন্য কোন রকমের চরমপন্থী হতেন তাহলেও হয়ত না, কারণ সে-বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সহযোগিতার ক্ষেত্র খুব সীমাবদ্ধ হত। ভারত ও বাংলাদেশ এই দুই রাষ্ট্রের বর্তমান নেতৃত্ব বজায় থাকলে দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের প্রভাব ক্ষুণ্ণ করা দুরূহ হবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে বিদেশী রাষ্ট্রগুলি যে কৃত্রিম ভারসাম্য সৃষ্টি করে এই অঞ্চলে তাঁদের অভিভাবকত্ব কায়েম রেখেছেন সেই ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য তাঁদের ভারত-বাংলাদেশ সহযোগিতা ও সহ-অস্তিত্বে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করতে হবে।

এর জন্য চেষ্টা নানাভাবে চলবে। কেউ খোলাখুলি শত্রুতা করবেন, কেউ মিত্রভাবে। এ-আঘাত দুই দেশের নেতৃত্বের উপরও আসতে

পারে। কারণ দেশের ভৌগোলিক আয়তন যাই হোক না কেন তার রাজনৈতিক নেতৃত্ব যদি শক্তিশালী হয়, জনসাধারণের আস্থাভাজন হয় তাহলে তার প্রভাব অন্য রাষ্ট্রেও প্রতিফলিত হতে বাধ্য। সুতরাং ভারত ও বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বকে দুর্বল করার চেষ্টাও স্বাভাবিক।

অন্য যে-স্তরে এ প্রচেষ্টা চলবে তা পাকিস্তানকে সামরিকভাবে শক্তিশালী করা। গত দুই দশক ধরে প্রচেষ্টা চলেছে। বাংলাদেশ সৃষ্টির পর এ-চেষ্টা আরও জোরে চলছে যাতে একদিকে ভারত ও বাংলাদেশের দুর্বল রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও তাঁদের পারস্পরিক সন্দেহ ও অন্যদিকে সামরিক শক্তিশালী পাকিস্তান এই দুইয়ের সমাবেশে বৃহস্পতিবার রমনার মাঠে যে শক্তিসাম্যের সমাধি হয়েছে তার অন্তত আংশিক পুনরুজ্জীবন সম্ভব হয়। অন্যথা এই শক্তিসাম্যের সৃষ্টিকারী ও সমর্থক দেশগুলির দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্র সম্পর্কে তাঁদের নীতি পরিবর্তন করতে হবে। বাংলাদেশ সমস্যা নিয়ে গত নয় মাসের পৃথিবীব্যাপী বিতর্কেই পরিষ্কার হয়ে গেছে আপাতত এই নীতি পরিবর্তনের কোন সম্ভাবনা নেই।

বাঙলাদেশ এবং অতঃপর

নিরঞ্জন সেনগুপ্ত

বাংলাদেশ মানে নূতন ইতিহাস। এবং নূতন ভূগোল। এবং অনিবার্যভাবেই সারা পৃথিবীকে নাড়া দেবার মতো ঘটনা। বাংলাদেশ ভারতের সীমান্তলগ্ন ও চীনের সীমান্ত থেকে অনতিদূরে। যে বঙ্গোপসাগর বৃহৎ নৌশক্তিগুলির প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্র হয়ে উঠতে পারে তারই বুক থেকে উঠে এসেছে বাংলাদেশ। তার জনসংখ্যা সাড়ে সাত কোটি, পৃথিবীর আর মাত্র সাতটি দেশ—চীন, ভারত, সোভিয়েট রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইন্দোনেশিয়া, জাপান ও ব্রাজিল —জনসংখ্যায় বাংলাদেশকে ছাড়িয়ে যায়। বিশ্বের এই কনিষ্ঠ রাষ্ট্রের উদ্ভব নিশ্চয় সকলের মনঃপুত নয়; কিন্তু কারোর পক্ষেই উপেক্ষণীয়ও নয়। ১৯৭১-এর পৃথিবীতে বাংলাদেশ না থাকলেও ১৯৭২-এর পৃথিবী বাংলাদেশ বাদ দিয়ে ভাবা যাবে না।

খুবই স্বাভাবিক যে পাকিস্তানের পরই যে দেশের উপর এই ঘটনায় গভীরতম ও সবচেয়ে দূরপ্রসারী প্রভাব পড়বে সেটি হল ভারতবর্ষ। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই যে কথাটা মনে পড়বে সেটা এই যে, বাংলাদেশের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের মানুষ একটা নূতন আত্মপ্রত্যয় অনুভব করল। পাকিস্তানকে ভাঙার চিরলালিত অভিলাষ পূর্ণ হয়েছে বলেই ভারত প্রসন্ন, এটা বাজে কথা এবং নিতান্ত পক্ষপাতদুষ্ট মিথ্যা রটনা। ভারত একটি সুপরিকল্পিত ও সময়বাঁধা কার্যক্রম নিয়ে একই সঙ্গে কূটনৈতিক ও সামরিক রণাঙ্গনে যুদ্ধে নেমেছে এবং চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো দুই বৃহৎ শক্তির বিরোধিতা সত্ত্বেও নিজের স্বার্থরক্ষার জন্য ও মহৎ আদর্শের জন্য মাথা

তুলে দাঁড়িয়েছে। ভারতবর্ষ যে সার্থকভাবে এটা করতে পেরেছে তাতেই এদেশের মানুষ একটা অনাস্বাদিত আত্মপ্রত্যয় লাভ করেছে। রাজ্যসভার সদস্য শ্রীভূপেশ গুপ্তের কথায়, নিজেদের ভারতীয় বলে পরিচয় দিতে অতঃপর আমরা একটু বেশী গর্ববোধ করব।

ভারতের আর একটা বড় লাভ, জিন্নার দ্বিজাতিতত্ত্ব ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। কতকটা এই দ্বিজাতিতত্ত্বেরই অনুসিদ্ধান্ত হিসাবে, পাকিস্তান সমগ্র উপমহাদেশের সকল মুসলমানের হয়ে কথা বলার হক দাবী করে এসেছে। এখন এই উপমহাদেশের মুসলমানরা তিন ঠাঁই হয়ে গেল :—বাংলাদেশে রইলেন সাড়ে ছয় কোটি, ভারতে ছয় কোটি ও পাকিস্তানে পাঁচ কোটি। এঁদের মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রব্যবস্থার অধীনে এলেন। ভারতে সাম্প্রদায়িকতার শক্তিকে দাবিয়ে রাখার কাজটা এখন অনেক সহজ হয়ে যাওয়া উচিত। দীর্ঘ ২৪ বছরের মধ্যে এই প্রথম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও দফায় দফায় উদ্বাস্তু সমাগমের সমস্যা থেকে ভারতের মুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা বাস্তব হয়ে উঠল।

একই সঙ্গে অনেক সহজ হয়ে গেল আমাদেব দেশের সীমান্ত-রক্ষার সমস্যা। অবিভক্ত পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের যে সীমান্তরেখা ছিল তার অর্ধেকের বেশীটাই ছিল পূর্বখণ্ডে। সীমান্তের সেই অংশ সম্পর্কে আমরা এখন নিশ্চিন্ত হতে পারি। এ একটা মস্ত বড় স্বস্তি। এই স্বস্তি যাতে আরও নির্ভরযোগ্য হতে পারে সেজন্য যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের একটা সীমান্ত চুক্তি করে নেওয়া যেতে পারে। আগেকার পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে ছিট-মহলগুলি সমেত বিভিন্ন অঞ্চল নিয়ে ভারতের পূর্ব সীমান্তে কিছু বিরোধ ছিল। সেগুলি এখন ঢাকার সরকারের সঙ্গে বসে মিটিয়ে নেওয়া আদৌ কঠিন হবে না।

বাংলাদেশ মানে একটি নূতন বাণিজ্য সম্ভাবনাও বটে। বাংলা-দেশকে হাজার মাইলের বেশী দূরবর্তী পশ্চিম পাকিস্তানের

উপনিবেশে পরিণত করে রাখা হয়েছিল। প্রতিবেশী ভারতের সঙ্গে তার বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে ওঠার যে স্বাভাবিক সুযোগ ছিল সেটা কাজে লাগাতে দেওয়া হয়নি পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থে। এখন সেই স্বাভাবিক বাণিজ্য-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা যাবে। বাংলাদেশের অর্থ-নৈতিক পুনর্বাসনের জন্য আপাতত কিছুদিন ভারতকে সেদেশে বেশ কিছু অর্থ ব্যয় করতে হতে পারে; কিন্তু দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক লেনদেন পরিণামে উভয়ের পক্ষেই লাভজনক হবে। বাংলাদেশে কাপড় যোগাবার ব্যাপারে ভারত পশ্চিম পাকিস্তানের স্থান এবং কয়লা যোগাবার ব্যাপারে চীন ও পোল্যাণ্ডের স্থান নিতে পারবে। অন্যদিকে ভারতের চটকলগুলির পাটের চাহিদা মেটাতে বাংলাদেশ থাইল্যাণ্ডের স্থান নিতে পারবে। এক দিক থেকে কাপড়, তেল, কেরোসিন প্রভৃতি এবং অন্য দিক থেকে মাছ, ডিম, সব্জী, নারকেল, সুপারি, নিউজপ্রিণ্ট প্রভৃতি আনার সুযোগ রয়েছে। পূর্ববঙ্গের জলপথ খুলে গেলে আসামের সঙ্গে কলকাতা বন্দরের ও অবশিষ্ট ভারতের যোগাযোগের সুবিধা হবে। পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের জন্য বন্যানিয়ন্ত্রণের যৌথ কর্মসূচী গ্রহণ করা সম্ভব হবে। দুই বাংলার মিলিত বাজারের লোকসংখ্যা হবে প্রায় ১২ কোটি, অর্থাৎ ইউরোপের বারোয়ারি বাজারে দুই তৃতীয়াংশ। এত বড় একটা বাজার অতঃপর বাংলা বই, পত্রপত্রিকা, চলচ্চিত্র ও রেকর্ডের জন্য উন্মুক্ত হবে বলে আশা করা যায়।

বাইরের দিকে তাকালে দেখা যাবে, বাংলাদেশ মানে সারা পৃথিবীর চোখে ভারতের মর্যাদাবৃদ্ধি। এই মর্যাদাবৃদ্ধি এক দিকে আদর্শনিষ্ঠার জন্য, অন্যদিকে সামরিক শক্তি ও পরিণত কূটনীতি-কুশলতার জন্য। কায়রোর আধাসরকারী 'আল আহ্‌রাম' পত্রিকার আন্তর্জাতিক সম্পাদক মহম্মদ হাক্কি লিখেছেন, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের সামরিক জয় ভারতকে বৃহৎ রাষ্ট্রের ভূমিকায় নামিয়েছে। তার এই নূতন মর্যাদার দরুণ ভারত সম্পর্কে মিশর সমেত সব দেশকে

তাদের নীতি পর্যালোচনা করে দেখতে হবে। লণ্ডনের 'ইকনমিস্ট' পত্রিকার কথায় 'ভারত' এই অঞ্চলে সবচেয়ে ক্ষমতাশালী সামরিক শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করল। ইরাণ থেকে ইন্দোচীনের মধ্যে যে একটি মাত্র দেশ তার আধিপত্যের প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারত তাকে ভারত সরিয়ে দিয়েছে।

বাংলাদেশের অভ্যুদয় চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল, পিকিংয়ে গিয়ে চেয়ারম্যান মাও-য়ের হাতে দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়াকে তুলে দিয়ে আসার ক্ষমতা এখন আর প্রেসিডেণ্ট নিকসনের নেই। সোভিয়েট রাশিয়া আর ভারতকে হিসাবের মধ্যে না এনে শুধু ওয়াশিংটন ও পিকিংয়ের সিদ্ধান্তের দ্বারা ভবিষ্যতে এই অঞ্চলের ভাগ্য নির্ধারণ করা যাবে না।

ভাঙা পাকিস্তান এখন আন্তর্জাতিক রাজনীতির মানচিত্রে কার্যত পশ্চিম এশিয়ার অংশ হয়ে গেল। ফলে, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে শক্তিসাম্য রক্ষা করার উদ্ভট পাশ্চাত্ত্য নীতি এখন সম্পূর্ণ অর্থহীন হয়ে পড়ল।

অর্থহীন হয়ে পড়ল 'প্যান-ইস্লামিজও'। লোকসংখ্যার দিক থেকে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম-প্রধান দেশ (ইন্দোনেশিয়ার পর) হয়েও বাংলাদেশ ইসলামী রাষ্ট্র নয়। 'প্যান-ইসলামিজিমের' পতাকা-বাহীদের পক্ষে এমন একটা রাষ্ট্রকে বর্জন করাও কঠিন, পুরোপুরি মেনে নেওয়াও কঠিন। বিশ্ব মুসলিম একতার কৃত্রিম আবরণটি খুলে গেলে ঐ আবরণের ভিতর প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার শক্তিগুলিকে আলাদা করে চিনে নেওয়া যাবে। দ্বিতীয় রাহুত, আশা করা যায়, আর হবে না।

কিন্তু ভারতের হিসাবের খাতায় বাংলাদেশ কি শুধু জমার অঙ্কই ফেলবে? যেমন, প্রতিবেশী ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলি কি এরপর ভারতের ঘোষিত 'শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের' নীতিতে আগের মতোই আস্থাশীল থাকবে? যাতে ভারতের আসল অভিসন্ধি সম্পর্কে সিংহল, নেপাল,

ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া প্রভৃতি দেশের নেতাদের মনে সংশয় ঢুকিয়ে দেওয়া যায় তার জন্য নিশ্চয়ই চেষ্টা হবে। কিন্তু ভারত তার অতীত রেকর্ডের দ্বারা এবং এবারকার যুদ্ধের মধ্যেও পশ্চিম পাকিস্তানের সীমান্তে একতরফা যুদ্ধ-বিরতি ঘোষণা করে প্রমাণ করেছে যে, তার কোন আগ্রাসী অভিসন্ধি নেই। প্রতিবেশী, রাষ্ট্র-গুলির প্রতি আচরণে ভারত যদি সতর্ক থাকে তাহলে ভবিষ্যতে সে এই ধরণের আশঙ্কা নিশ্চয়ই দূর করতে পারবে।

ঠিক তেমনিভাবেই বলা যায়, ভারত ও বাংলাদেশের সরকার ও জনসাধারণের নিরন্তন সতর্কতা ছাড়া দুই দেশের মধ্যে স্থায়ী মৈত্রীর অন্য কোন সুনিশ্চিত গ্যারান্টি নেই। এই মৈত্রী নষ্ট করার জন্য হরেক রকম চক্রান্ত চলবে। (প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দিন ইতিমধ্যে সেই চক্রান্তের কথা বলেছেন।) তা ছাড়া, ইতিহাসের এমন কোন অলজ্ঘনীয় নিয়ম নেই যে, মুক্তিসংগ্রামের সহযাত্রী দেশের প্রতি মুক্ত জাতির কৃতজ্ঞতা নিরবধিকাল পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। এমন নিয়ম যদি থাকত তা হলে দশ বছরের মধ্যে চীন ও সোভিয়েট রাশিয়ার সম্পর্ক বিষিয়ে যেত না। আপাতত শুধু এইটুকুই বলা চলে যে, ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে আজকের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কে যদি চিড় ধরে তাহলে সেটা ঘটবে দুই দেশের নেতাদেরই ভুলে এবং বৃহত্তর দেশ হিসাবে ভারতের দায়িত্বই এ বিষয়ে বেশী।

আর একটি সন্দিগ্ধ প্রশ্ন :—বাংলাদেশের নজির অন্যত্রও ছড়াবে না তো? সেই নজির হল, একটা স্বাধীন দেশেরও একাংশ অন্য অংশের উপনিবেশে পরিণত হতে পারে এবং সেই শোষণ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ঐ অংশটি বিদ্রোহ করে বিচ্ছিন্ন হয়ে আসতে পারে। এটা যেমন একটা অভূতপূর্ব ঘটনা তেমনি একথাও মনে রাখতে হবে যে, অবিভক্ত পাকিস্তানও ছিল একটা নজির-ছাড়া দেশ। আর কোন দেশ আছে যার দুই অংশ হাজার মাইলের বেশী পরভূমির দ্বারা খণ্ডিত, ভিন্‌দেশের মাটি না ছুঁয়ে যার এক অংশ থেকে অন্য অংশে

যেতে হলে করাচী থেকে রোমের দূরত্ব (প্রায় তিন হাজার মাইল) পার হতে হয়। সুতরাং পাকিস্তানের নজির অন্য কোন দেশের ক্ষেত্রেই ঠিক ঠিকভাবে খাটবে না। পাশ্চাত্ত্য মুরব্বিরা যাই বলুন, এই নজিরে ভারতের বিচলিত হওয়ার কারণ নেই। বাংলাদেশের জন্য দিল্লী শেষ পর্যন্ত যা করেছে তাতে নয়াদিল্লী সম্পর্কে পশ্চিম-বঙ্গের বাঙালীর বিতৃষ্ণা বাড়েনি, বরং প্রীতিই বেড়েছে। যাঁরা উল্টো কথা বলেছিলেন তাঁদের ভবিষ্যদ্বাণীই বরং মিথ্যা হয়ে গেছে। অন্যদিকে, বাংলাদেশের দৃষ্টান্তে পাকিস্তানের সিন্ধু, বেলুচিস্থান ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই অনেক বেশী।

আরও একটি প্রশ্ন বহু-আলোচিত। বাংলাদেশের টানে পশ্চিম-বঙ্গের রাজনীতিও কি কিছু দিনের মধ্যে চরমপন্থার দিকে ঝুঁকতে পারে না? নিশ্চয়ই পারে। সীমান্তের প্রাচীর ডিঙিয়েও যখন ভারতীয় রাজনীতির ধারণাগুলি ওপারে যেতে পেরেছে তখন আজকের খোলামেলা আবহাওয়ায় একের রাজনীতি অন্যকে স্পর্শ করা খুবই সম্ভব। দুই বাংলার মধ্যে তো অবশ্যই, কেন না দুইয়েরই এক ভাষা। তবে একথা ঠিক যে, বাংলাদেশ সম্পর্কে চীন যে ভূমিকা গ্রহণ করেছে তাতে সেখানে মাওবাদী চরমপন্থীদের আপাতত বেশ কিছুদিন মাথা নিচু করে থাকতে হবে।

স্বচক্ষে সকালের অপেক্ষায়, ওপার বাংলায়

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

একই দিনে সকালের কাগজে আগরতলায় বোমা পড়ার খবর আর রাত্রে বেতারে যুদ্ধাবস্থার ঘোষণা। মাঝে শুধু ষোল ঘণ্টা সময় আমি কলকাতার বাইরে—তার মধ্যে পাঁচ থেকে ছ ঘণ্টা কাটিয়েছি মাইল তিনেক ভেতর অবধি বাংলাদেশে। মুক্তিফৌজের শিবিরে, বাঙ্কারে আর শত্রু মুক্ত গ্রামে।

৩রা ডিসেম্বর তারিখেই যে এমন একটা সুযোগ হাতে এসে যাবে, এটা আমার কল্পনারও বাইরে ছিল। নানা মহলে চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে ধরেই নিয়েছিলাম যে, আমার মত উটকো লোকের পক্ষে এ অবস্থায় সীমান্ত পার হয়ে দেখে শুনে আসা সম্ভব নয়।

তবু অন্তত বর্ডার অবধি ঘুরে আসা যাবে এই রকমের একটা ভরসা পেয়ে মুক্তিফৌজের সাহায্যকারী তিন বন্ধুর একটি দলের সঙ্গে আমি জুটে গিয়েছিলাম।

সকালের বাসে গিয়ে সীমান্ত দেখে সন্ধ্যের শেষ বাস ধরে রাত্তিরে কলকাতায় ফেরা। সফরের এই ছিল ছক। আগে কি আর জানতাম এই ছকের জন্মে পরে আপসোস করতে হবে? যখন জানলাম তখন আর তা থেকে ফেরবার কোনো উপায় নেই।

আমরা যারা নিরাপদ দূরত্বে থাকি, উপদ্রুত বর্ডারের কাছাকাছি এলাকা সম্পর্কে আমাদের ধারণাগুলো অনেক সময়ই হয় মনগড়া। বাসে আসতে আসতে সেটা টের পাচ্ছিলাম।

সকালের বাসে তো বটেই এমন কি শেষ বাসেও, সারা রাস্তা যাত্রীদের যাতায়াতের বিরাম নেই। লোকজনের কথাবার্তায়

চালচলনে জীবনযাত্রায় কোথাও এতটুকু আতঙ্কের ভাব দেখলাম না। ইস্কুল কলেজ দোকানপাট সব কিছুই স্বাভাবিকভাবে চলছে।

নৌকোয় ইছামতী পার হয়ে আমরা প্রথমেই গেলাম মুক্তিফৌজের ছাউনিতে। গেটে ত্বজন কমবয়সী বন্দুকধারী পাহারা।

হক সাহেব অভ্যর্থনা জানিয়ে আমাদের ভেতরে নিয়ে গেলেন। একপাশে পূর্ববাংলার একটা পুরনো বাস। এক জায়গায় ট্রাক থেকে খালাস করা হচ্ছে মরটারের গোলা।

গাছের নিচে টেবিল পাতা। চারপাশে চেয়ার। খানিক পরেই চা এসে গেল।

একটু ইতস্তত করে তারপর সীমান্তের ওপারে যাওয়ার কথাটা পাড়া হল। সঙ্গে সঙ্গে 'না' বলে দিলেও আমরা কিছু মনে করতাম না। হক সাহেব একটু ভাবলেন। তারপরই রাজী হয়ে গেলেন। পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে আমাদের সঙ্গে লোক যাবে। তা ছাড়া মুক্তিফৌজকে ডিফেনসের জায়গায় খাবার পৌঁছে দেবার জন্যে বাহকদের নিয়ে খানিকটা রাস্তা যাবে জীপ। কাজেই এপারে কিছুটা রাস্তা আমরা হাঁটার হাত থেকে বাঁচব।

দেয়ালে টাঙানো সেক্টরের বড় ম্যাপে অবস্থাটা একটু বুঝিয়ে দিলেন হক সাহেব। এই হল ভোমরা-সাতক্ষীরা রাস্তা। ত্বপাশ থেকে সরে এসে রাস্তা জুড়ে মাঝখানের এই ত্বটো জায়গায় পাক ফৌজ ঘাঁটি গেড়ে রয়েছে। দ্বিতীয় জায়গায় মুখোমুখি হয়ে জমির ওপর বাঙ্কার খুঁড়ে আক্রমণের অপেক্ষায় আছে একদল মুক্তিফৌজ। এই পর্যন্ত যেতে পারবেন আপনারা। দক্ষিণে এই বিরাট জায়গা জুড়ে একটানা মুক্তাঞ্চল। তাছাড়া সাতক্ষীরার রাস্তাটুকু ছাড়া ডাইনে বাঁয়ে পুরোটাই আমাদের দখলে।

হতাহতের অনুপাত কি রকম ?

ওদের প্রতি এক শো'তে আমাদের এক কিংবা ত্বই।

শিবিরে আরও কয়েকজন ছিলেন। তাঁরা বললেন, আগে এলে দেখতেন এখানে গিজ গিজ করছে লোক। এখন সবাই ভেতরে অনেক দূর এগিয়ে এগিয়ে চলে গেছে।

পাক সৈন্যদের মনোবল কি রকম?

মারতে তো কসুর করছে না ওরা। তবে ধরা পড়লে ওদের দেখতে হয়। ভয়ে থর থর ক'রে কাঁপে। মনের জোর ব'লে কিছু নেই, অস্ত্রের জোরই ওদের জোর।

কথা শেষ ক'রে জীপে উঠলাম। গ্রামের ভেতর দিয়ে গরুর গাড়ির রাস্তা যতদূর, সেই অবধি গিয়ে থামল। খড়ের চাল দেওয়া মাটির ঘরে ইস্কুল হচ্ছে। আশপাশের বাড়িগুলোতে চরকা আর তাঁত চলার শব্দ। ঘরে ঘরে তৈরি হচ্ছে ব্যাণ্ডেজের কাপড়।

গ্রামের নাম পানিতর। দেখলেই বোঝা যায় বর্ষায় পাশের ঢালু জায়গাটা জলে জলাকার হয়।

কিছু কিছু জায়গায় নদীর জোয়ারের জল আটকা পড়ে থাকে। তার ওপর বাঁশের সাঁকো।

বেশ খানিকটা এগিয়ে গেলে কাটা খাল। এই খালের ওপারে আগেকার পাকিস্তান আর এখনকার বাংলাদেশ।

এই খালের এপার-ওপার জুড়ে বিরাজ করছে সীমান্তের আইনভাঙা বাঁশের এক সাঁকো। পাক বর্গীর হাঙ্গামায় হাজার হাজার ওপারের লোক শরণার্থী হয়ে এসেছে এপারে। এই সাঁকো দিয়েই আবার শরণার্থীরা ওপারে ফিরবে।

সাঁকোটা পেরিয়ে যখন বাংলাদেশের মাটিতে পা দিলাম তখন খুব অবাক লাগল। মাটিতে, গাছপালায়, মানুষের হাবভাবে আর ভাষায় কোথাও কোনো তফাত নেই।

দুজন বয়স্ক লোক বাঁধ রাস্তায় ওপর দিয়ে যাচ্ছিল। একজনের বাড়ি সাকরায়, আরেকজনের গয়েসপুরে।

বার বার করে তারা জানতে চাইল আমাদের সঙ্গে তাদের যাওয়ার দরকার আছে কিনা।

আমাদের সঙ্গে মুক্তিফৌজের যে লোকটি পথপ্রদর্শক হয়ে হাঁটছিলেন, তিনি যেতে যেতে বললেন, এখানকার সমস্ত গ্রামের লোকই এতদিন গোপনে গোপনে আমাদের সাহায্য করে এসেছে। গ্রামে লোকজন থাকলে মুক্তিফৌজের খুব সুবিধে হয়। তাদের কাছ থেকে খাবার আর খবর একসঙ্গে দুটোই পাওয়া যায়।

বাঁধের ডানদিকে একটু এগিয়ে একটা স্লুইস গেট। মুক্তিবাহিনী গোড়ার দিকেই ডিনামাইট দিয়ে সেটা উড়িয়ে দিয়েছিল; তার ফলে, বড় একটা এলাকা জলে ডুবে যাওয়ার পাক ফৌজ বেশি দূর এগোতে পারেনি।

বাঁ দিকে বাঁধের রাস্তা বরাবর সাতক্ষীরার রাস্তার দিকে আমরা উত্তরে এগোতে থাকলাম। কিছু দূর অন্তর অন্তর রাস্তার পাশে পরিত্যক্ত বাঙ্কার আর গড়খাই। মুক্তিফৌজ যেমন যেমন এগিয়েছে, সেই মত পুরনো বাঙ্কার ছেড়ে নতুন বাঙ্কারে গিয়ে ঘাঁটি গেড়েছে। সবচেয়ে আগুয়ান বাঙ্কার এখন পাঁচ মাইল ভেতরে। পাক ঘাঁটির প্রায় নাকের গোড়ায়।

বাঁধের রাস্তা থেকে পূর্বের দিকে গাঁয়ের পায়ে-চলা রাস্তায় নামতে নামতে আমাদের পথপ্রদর্শক বন্ধুটি বললেন, ঐ যে দেখুন রিফিউজি লতা—এ অঞ্চলে বন্যার পর হয়েছে।

বাঁধ থেকে গাঁয়ের রাস্তায় নেমে গেছে খুঁটির গায়ে জড়ানো তার। এই তার দিয়ে মূল শিবির আর অগ্রবর্তী প্রত্যেকটি ঘাঁটির মধ্যে টেলিফোনে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে।

বুনো ঝোপেঝাড়ে চারদিক ছেয়ে গেছে। দেখেই বোঝা যায়, এ রাস্তায় অনেকদিন মানুষ পদার্পণ করেনি। বেশ খানিকটা এগোবার পর মধ্যবিত্ত ঘরের দুটি ছেলেমেয়েকে আসতে দেখা গেল। কলেজ

ইস্কুলে-পড়া ভাই আর বোন। এতদিন ছিল না; মুক্তিফৌজ এগিয়ে যাওয়ায় দিন দুই হল আবার গ্রামে ফিরে এসেছে।

মুচিপাড়ার ভেতর দিয়ে যেতে যেতে দু' পাশে দেখলাম খাঁ খাঁ করছে ঘরবাড়ি। একটাতেও লোক নেই। দাওয়ার ওপর মাটির হাঁড়ি-কলসী। ধানের গোলাগুলো ভেঙে তছনছ করা হয়েছে। খসিয়ে নেওয়া কাঠের জানলা-দরজাগুলো হাঁ হাঁ করছে।

এরপর ভোমরা গ্রামে এসে পৌঁছুলাম মুক্তিফৌজের এক ঘাঁটিতে। পরিত্যক্ত বাড়িটি কোনও এক সম্পন্ন চাষীর। উঠোনে কয়েকটা মরাই। পৈঁঠে দেওয়া উঁচু দাওয়া। টিনের চালের মাথায় টিন কেটে লেখা: "গোলাপ মিস্ত্রী ১৩৬৯ সাল ১লা বৈশাখ ভোমরা ধোনাই ভবন।"

ধোনাই ভবনে বসে থাকতে থাকতে মুক্তিফৌজের মর্টার ঘাঁটির ভারপ্রাপ্ত নুরুলের সঙ্গে আলাপ হল। নুরুল বললেন, গ্রামে ঢুকবার সময় ডান দিকের প্রথম বাড়িটা লক্ষ্য করেছিলেন কি? ঈদের দু'দিন আগে ঐ বাড়ির দেয়ালে পিঠ দিয়ে গাঁয়ের এগারো জন লোককে দাঁড় করিয়ে খানসেনারা গুলি করে মেরেছিল। রক্ত ধুয়ে ফেলা হয়েছে বটে, কিন্তু গেলে এখনও তার দাগ দেখতে পাবেন।

গ্রামে এখন একটা বাড়িতেও লোক নেই। আজকাল অবশ্য পুরুষরা দিনের বেলায় এসে চাষবাসের কাজ করে দিন থাকতেই ফিরে চলে যায়। মেয়েদের নিয়ে এসে সপরিবারে বসবাস করতে এখনও তাদের ভয়। খানসেনারা গাঁয়ে ঢুকে প্রথমেই টেনে নিয়ে যেত মেয়েদের। বলা যায় না, খানসেনারা আবার যদি ফিরে আসে।

গাঁ পেরিয়ে খেজুর বনের মধ্যে মর্টারের যে ঘাঁটি, নুরুলের উপরোধে সেখানে যেতেই হল। যারা রাত জেগেছে, ছাউনির তলায় মাচার ওপর তখনও তারা ঘুমোচ্ছে।

কোথাও সিগারেট, কোথাও ডাব, কোথাও চা—লড়াইয়ের ময়দানে বসেও আতিথেয়তার কোনও ত্রুটি নেই। খুবই লজ্জা করছিল। কিন্তু ওঁরাও নাছোড়বান্দা।

তারপর মাঠ পেরিয়ে চৌবাড়ির উত্তরে সুবেদার জাহাঙ্গীর সাহেবদের ঘাঁটি। আর মাইল দুই পূবে গেলে মুক্তিফৌজের সবচেয়ে সামনের বাঙ্কার। জাহাঙ্গীর সাহেবরা এ বাঙ্কার খালি করে একেবারে সামনের ঘাঁটিতে কালকেই চলে যাবেন। এখন ওয়াকি-টকিতে এই দুই ঘাঁটির যোগাযোগ রাখা হচ্ছে।

যেখানে ওঁদের বাঙ্কার, সেখান থেকে দেখা যাচ্ছিল মাঠের মধ্যে একদল লোক ধান কাটাই-মাড়াই করছে। ওরা চৌবাড়ি গাঁয়ের লোক। ওরা কেউ গ্রাম ছেড়ে যায়নি।

পাক ফৌজের হাতে চৌবাড়ি গ্রামের কী দশা হয়েছিল, তার গল্প বলল ঐ গ্রামের দাড়িওয়ালা রহিম বক্স গাঈন। পিঠটা দেখিয়ে বলল, সেপাইরা আমাকে কি রকম পিটিয়েছে দেখুন – আমাকে ওরা বলেছিল আমি নাকি মুক্তিফৌজের লোক।

জমাদার মজিদ সাহেক এতক্ষণ ছিলেন না। এসে রহিম বক্সকে দেখে বললেন—ফটো তোলার গল্পটা এঁদের বলেছ?

গাঁয়ের সমস্ত মেয়েপুরুষকে কুলিয়া ব্রিজের তলায় নিয়ে গিয়ে নৌকোয় বসিয়ে পাকফৌজ ছবি তুলে কাগজে ছেপে ছিল এই বলে যে, রিফিউজির দল আবার সব গ্রামে ফিরে আসছে। কিন্তু এই সাজানো রিফিউজিরাও সেদিন সবাই তাদের বাড়িতে ফিরে যেতে পারেনি। পরে পাকফৌজের হাতে-পড়া সেদিনের নিখোঁজ পাঁচটি মেয়ের লাশ নদীর জলে ভেসে উঠতে দেখা গিয়েছিল।

রহিম বক্সের গলা ধরে গিয়েছিল বলতে বলতে। ওরা বাড়ির পর বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে। আর এ কাজে তাদের ডান হাত ছিল ঐ গ্রামেরই মাতব্বর গফ্ফর সর্দার। দিন কয়েক হল গ্রাম ছেড়ে

সে পালিয়ে গেছে। খানসেনারা হাটে হাটে এখন এই বলে ঢোল দিয়ে বেড়াচ্ছে যে, চল্লিশ বছরের নিচে যাদের বয়স পল্টনে নাম না লেখালে তাদের গর্দান যাবে।

তারপর একটু থেমে রহিম বক্স বলল, ওরা মানুষ নয়।

ট্রেনিং-পাওয়া তিনজন নতুন রিক্রুট বন্দুক হাতে নিয়ে এসে হাজির। তারা লড়বে। উনিশ-কুড়ি বছর বয়স। লুঙ্গিপরা আবুল হোসেন আর ইউসুফ আলি। চাষীর ঘরের ছেলে। আর সেই সঙ্গে প্যান্টপরা রবীন্দ্রনাথ সাহা। মিলে কাজ করত। তিনজনই ইস্কুলে পড়েছে। চোখের দিকে তাকালাম—ভয়ের চিহ্ন নেই।

চা-জলখাবারের পর্ব সারতে সারতে বেলা পড়ে এল। আরও ক্রোশখানেক রাস্তা এগোলে আর সন্ধ্যের মধ্যে ফেরা যাবে না। বাঁশের সরু সাঁকো। নদীর এপারে কারফিউ। কাজেই তাড়াতাড়ি রওনা হতে হল।

ক্ষেতের আল দিয়ে দিয়ে রাস্তা সংক্ষেপ করে আমরা যখন পদ্মসাকরায় পৌঁছুলাম, সূর্য তখন ডুবছে। মাঠের মধ্যে ছড়াসুদ্ধ কাটা ধান। লোকবল কম। তাই একবারে নেওয়া যাচ্ছে না। ধারে কাছে মুক্তিফৌজ। কাজেই চুরি হওয়ার ভয় নেই।

দু'পাশে রাশি রাশি খেজুর গাছ। গ্রামের ধারে কাছের গাছ-গুলোতেই সবে দা-কাটা দাগ। বাড়ির আশপাশে দু' চারদিন আগে বোনা সরষের চারাগুলো সবে মাথা তুলতে শুরু করেছে।

কিন্তু এবারের ধান মানুষের বোনা নয়। প্রকৃতিদত্ত। আগের বছরের ধান থেকে আপনা আপনি ফসল ফলেছে।

অটোমেটিক রাইফেল হাতে আমাদের যিনি এগিয়ে দিতে এসেছিলেন, মুক্তিফৌজের সেই সৈনিকটি বললেন, এবারের ধান হয়েছে অটোমেটিক। কেননা চাষ করা তো আর সম্ভব হয়নি।

পদ্মসাকরায় ঢুকে আমরা অবাক হয়ে গেলাম। গ্রামের আবাল-বৃদ্ধবণিতা সবাই গত দু' তিনদিন হল ক্যাম্প থেকে ফিরে এসেছে।

দেখে চেনবার জো নেই যে, ক'দিন আগেও এরা ছিল লক্ষ লক্ষ হতভাগ্য শরণার্থীর দলে। চোখেমুখে আতঙ্কের লেশ নেই। উঠোনে স্তূপাকার ধান।

রাস্তা দিয়ে ফিরতে ফিরতে দেখলাম একটি পরিবার গ্রামে ফিরছে। এক ছেলের হাতে টিনের সুটকেস। মেয়ের হাতে পুঁটুলি। মার কোলে শিশু।

একটা হানাবাড়ি যেন প্রাণ পেয়ে জেগে উঠছে।

জোয়ারের জলের কাদা ভেঙে নড়বড়ে সাঁকো পেরিয়ে সীমান্তের এপারে এসে পানিতরের গ্রামে ঢুকতে যাব, ঠিক সেই সময় তিনবার মর্টার ছোঁড়ার আওয়াজ। সঙ্গে সঙ্গে চোখের সামনে ভেসে উঠল মুকুলের মুখ। যে মুখ ঘৃণায় বিকৃত নয়, ভালবাসায় উজ্জ্বল।

যেদিকে মুকুলদের রেখে এসেছিলাম পেছন ফিরে সেইদিকে তাকালাম। আকাশে লাল চন্দনের কৌটার মত চাঁদ সেই শত্রুদের সনাক্ত করছে—যারা মানুষ নয়।

মুক্তিফৌজের শিবিরে পৌঁছে শুনি খাবার তৈরি করে সাড়ে তিনটে থেকে তাঁরা আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন। আমরা না আসায় সমস্ত ঘাঁটিতে টেলিফোন করে খবর নিয়েছেন।

কিন্তু তৎক্ষণাৎ ঝোলাঝুলি কাঁধে ফেলে ফেরী পার না হলে আমরা আর সে রাত্রে ফেরবার বাস পেতাম না।

বাসে আসতে আসতে দেখলাম, হাজার হাজার শরণার্থী নদীর ধারে সার বাধা নৌকোয় রাত্রি প্রভাতের অপেক্ষায়। আর তাদেরই ঘরের মানুষেরা বাংলাদেশের মাঠে মাঠে রাত জেগে আগুনের মুখে ঘনিয়ে আনছে স্বাধীনতার নতুন দিন।

বাঙালী, বাঙালীত্ব—জাতি ও সংস্কৃতি

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

অনেক রক্তপাত অনেক চোখের জল আছে এর পেছনে। তবু ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের স্বীকৃতিতে আমাদের ধ্যান ধারণার বাংলার যে চিন্ময়ী রূপটি ছিল তার সম্মান-প্রতিষ্ঠা হয়ে গেল।

একদিন রবীন্দ্রনাথ সারা পৃথিবীর কাছে বাংলাদেশের কথা পৌঁছে দিয়েছিলেন, আজ মুক্তিবাহিনীর অসম সাহসী তরুণরা পৃথিবীর কাছ থেকে বাঙালী জাতির জন্য অন্য একরকমের সম্মান আদায় করে নিল।

এই জাতটার ওপর দিয়ে কম ঝঞ্ঝা—দুর্দিন যায় নি। বিদেশী শক্তির চক্রান্তে কয়েক শতাব্দীর মধ্যে দুটো বিশাল দুর্ভিক্ষ ঘটিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তাতে মারা গেছে লক্ষ-নিযুত মানুষ। বৃটিশ আমলে ভয়ঙ্করভাবে শোষিত ও অত্যাচারিত এই ভূখণ্ড। ১৯০৫ সালে বাংলাকে দু' ভাগ করে দেবার ষড়যন্ত্র হয়েছিল। ১৯৪৭ সালে সত্যিই দু' ভাগ হয়ে গেল। বাংলা বিভাগের দুঃখ হয়তো আমাদের কোনদিন ঘুচবে না, কিন্তু এতদিন পর তার একটি খণ্ড যে বাংলাদেশ নাম নিয়ে স্বাধীন রাজ্য হতে পারলো—এ আনন্দেরও অবধি নেই। ধর্মের প্রশ্নে দেশ ভাগ হয়েছিল, আজ স্বাধীন বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র, যেখানে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে নারী পুরুষের সমান অধিকার।

আর্য সভ্যতার প্রথম যুগে অবজ্ঞাত এই বাঙালীরা বিভিন্ন আদিবাসী কৌমের সংযোগে গড়ে উঠেছে, তৈরী করেছে নিজেদের আলাদা সংস্কৃতি। পরবর্তীকালে আর্য ও ইসলাম সংস্কৃতির প্রভাব

পড়েছে - কিন্তু বাঙালী তা আত্মসাৎ করেছে। তার মধ্যে হারিয়ে যায় নি। আদি অস্ট্রেলিয়া বা ভেড্ডিড্ মঙ্গোলীয় শাখার প্যারোইয়ান, ইন্দো-আর্য ও শক-পামিরীয় উপাদান এবং মালয়-ইন্দোনেশীয়দের সংমিশ্রণে তৈরী হলো যে জাত তারা খুব বেশী লম্বাও নয় বেঁটেও নয়, মাথার গড়ন দীর্ঘও নয় গোলও নয়, নাক খুব টিকোলোও নয় থ্যাবড়াও নয়, গায়ের রং খুব ফর্সাও নয়, ঘোর কৃষ্ণবর্ণও নয়। এই জাত সম্পর্কে বিদেশীরা নানারকম ধাঁধায় পড়েছে। কেউ বলেছে এই জাত অতি বুদ্ধিমান কিন্তু ভীরু, খুব খেতে ভালোবাসে অথচ কাজ করে না। অতিরিক্ত বাক্যবাগীশ কিন্তু পরাধীনতা মানে না।

রণ-দুর্মদ জাতি হিসেবে বাঙালীদের কোন প্রসিদ্ধি নেই, যদিও দশাননজয়ী রামচন্দ্রের প্রপিতামহের সঙ্গে নাকি বাঙালী সৈন্যরা সজ্জিত চতুরঙ্গে যুদ্ধ করেছিল, দ্রৌপদীর স্বয়ংম্বর সভায় পাণিপ্রার্থী ছিলেন তিনজন বাঙালী রাজা—যুদ্ধ করেছিলেন কৃষ্ণার্জুনের বিরুদ্ধে। টলেমি লিখেছেন গঙ্গাহৃদি (গংগারিডি) জাতির ঐরাবত বাহিনীর প্রতাপেই নাকি আলেকজান্দার ভারত পরিত্যাগ করেন। তবু গৌরব হয়নি বাঙালীর—ভেতো বাঙালী বলেই পরিচিতি। তিতু মীর, সূর্য সেন প্রভৃতির বীরত্ব অনেকটা ব্যক্তিগত কীর্তি হিসেবে চিহ্নিত,—হঠাৎ ১৯৭১ সালে বাঙালীরা দেখিয়ে দিল নিছক সন্ত্রাস সৃষ্টিই নয়, সঙ্ঘবদ্ধভাবে তারা কী অসম সাহসিকতার সঙ্গে লড়াই করতে পারে। পঁচিশে মারচ পূর্ববাংলায় শুরু হলো তাণ্ডব, তার পরদিন থেকেই তৈরী হয়ে গেল প্রতিরোধ বাহিনী। সুশৃঙ্খল এবং আধুনিকতম অস্ত্রে সজ্জিত নিষ্ঠুর পাকিস্তানী বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রায় নিরস্ত্র বাঙালী জাতির এই রুখে দাঁড়ানো পৃথিবীর ইতিহাসে নতুন দৃষ্টান্ত হয়ে রইলো। মুক্তিবাহিনীর অপারেশন আমি নিজের চোখে দেখতে গিয়েছি কয়েকবার—দেখেছি কী অসীম মনোবল তাদের, অসম্ভব কষ্ট সহ্য করেও প্রতিজ্ঞা পালনের কি অদ্ভুত দৃঢ়তা। বাঙালী হিসেবে তখন গর্ব অনুভব করেছি। ঠোঁট কাটা বিদেশী সাংবাদিকরাও

মুক্তিবাহিনীর প্রশংসা না করে পারে নি, বিলেতি পত্র-পত্রিকায় প্রতিবেদন বেরিয়েছে যে, কোন কোন দিকে বাঙালী গেরিলারা ভিয়েৎনামী গেরিলাদের থেকেও বেশী সার্থক। বাংলাদেশের মানুষ লড়াই করে স্বাধীনতা অর্জন করছে।

বাংলা দু' ভাগ হবার দুঃখ আমরা অনেকেই কোনদিন ভুলবো না, কিন্তু মেনে নেব। ইতিহাসের গতি আঁকাবাঁকা হলেও জোর করে বদলানো যায় না। খণ্ডিত বাংলার এক অংশ বাংলাদেশ নামে স্বাধীন হলো। এ পাশে পড়ে রইলো যে পশ্চিম বাংলা সে কি আর তা হলে বাংলা নয়, সেখানকার মানুষ নয় বাঙালী? বৃটিশ আমলে যা ছিল বাংলাদেশ বা বেঙ্গল, ইতিহাসে কোনদিনই তা স্থায়ী ভাবে এক রাজ্যের অধীন ছিল না, অনেক সময় নামও বদলেছে, পুণ্ড্র, গৌড়, রাঢ়, সুহ্ম, বজ্র, সমতট ইত্যাদি আঞ্চলিক নাম উদ্ভুত হয়েছে। বরং ইতিহাসের সাক্ষ্য প্রমাণ থেকে পাওয়া যায়, পূর্ববাংলারই বাংলাদেশ নামের ওপর অধিকার বেশী। আকবরের আমলে পূর্ব পশ্চিম ভূখণ্ড সুবে বাংলা নামে চিহ্নিত হওয়ায় গৌড়জনবাসীরাও বাঙালী হয়েছিল। যাই হোক, ১৯৪৭-এর পর আমরা মর্মে মর্মে বুঝেছি, বাঙালীত্ব কোনো ভৌগোলিক সীমানার ওপর নির্ভরশীল নয়—ধর্মের প্রশ্নে নয়, সাংস্কৃতিক মিলেই আমরা বাঙালী। এবং এর পরেও তাই থাকবো।

একথাও ঠিক, বাঙালী সংস্কৃতিকে অধুনা উজ্জীবিত করেছে পূর্ব বাংলার মানুষই বেশী। দেশ বিভাগের পর, উভয় দেশের রেষারেষির ফলে পূর্ববাংলার মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল পশ্চিমবাংলা থেকে। কিন্তু অত্যাচারী পাকিস্তানীদের সঙ্গে তাদের রুচি ও সংস্কৃতির এতই অমিল যে ধর্মের দোহাই দিয়েও তারা মিশে যেতে পারেনি শাসকদের সঙ্গে। আত্মরক্ষার জন্যই তারা সংস্কৃতির দিক থেকে সুসংহত হয়েছে, তারা নতুনভাবে আবিষ্কার করেছে রবীন্দ্রনাথ-নজরুল-জীবনানন্দকে। পশ্চিম পাকিস্তানীদের অত্যাচার, তাদের কাছে শাপে বর হয়েছে, তারা কৃত্রিমভাবে পাকিস্তানী হয়নি বেশী

করে বাঙালী হয়েছে। এদিকে, পশ্চিমবঙ্গের দিকে সমগ্র উত্তর ভারত খোলা, সেখানকার ঢেউ মাঝে মাঝে ঝাপটা দিয়েছে এদিকে হিন্দী ফিলমের কুরুচি ঢুকে গেছে অনেক গভীরে, আমাদের অনেকের কাছেই বাংলার সংস্কৃতি ঝাপসা।

স্বাধীন গণতান্ত্রিক প্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশের জন্ম হলো। বাংলাদেশের মানুষ নির্বাচনের মাধ্যমে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার চেয়েছিল, পাকিস্তানী শাসকরা বর্বর উপায়ে তা দমন করতে চেয়েছিল। বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রী দেশ হিসেবে ভারত প্রতিবেশী রাজ্যের এই গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে এসেছে। গণতন্ত্রের চ্যামপিয়ন হিসেবে ঘোষণাকারী আমেরিকা এই সময়ে নিয়েছে ঘৃণিত ভূমিকা। ব্রিটিশের ভূমিকা ক্লীবের মতন। বিশ্বের শোষিত জনগণের নেতা হিসেবে গণ্য হতে চায় যে প্রজাতন্ত্রী চীন—বাংলাদেশের মানুষের ওপর ইতিহাসের জঘন্যতম অত্যাচারের কথা জেনেও মুখ ফিরিয়ে রইলো কোন্ যুক্তিতে জানি না। রাশিয়া অপ্রত্যক্ষ সাহায্য করেছে বলে আমরা কৃতজ্ঞ। ভারত এই ঐতিহাসিক ভূমিকা না নিয়ে যদি কোনোরকম বিচ্যুতি দেখাতো—আমাদের লজ্জা রাখবার জায়গা থাকতো না। এই বিবেকসম্মত ভূমিকা নিতে পেরেছে বলে আজ আমাদের অসম্ভব গর্ব।

"হৃদয়ের রাখীবন্ধনে ভারত বাঙলাদেশ"

প্রণবেশ সেন

এ দেশ আমার গর্ব, এ মাটি আমার কাছে সোনা—এই কথা ঘোষণা করতে কতবার ভয়ে কেঁপেছি, দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছি। ভেবেছি, এ শুধু কথার মানুষ, এর পেছনে সেই সত্য নেই, নিষ্ঠা নেই, যা কবিতার পংক্তিটিকে জীবন-সত্যে রূপায়িত করতে পারে।

বুকের মাঝখানটিতে কোথায় যেন একরাশ শ্যাওলা জমেছিল, দেখতে পাচ্ছিলাম না আমার নিজেকে, কাক-চক্ষু-স্বচ্ছ সেই যে আমার হৃদয়কে, যা প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে, নিজেকে, বিশ্বমানবতার সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, মুক্তোর মত দ্যুতিমান হয়ে ওঠে। ৬ই ডিসেম্বর বেলা সাড়ে দশটা,—কে জানত, আমার জন্যে, আপনার জন্যে, এদেশের প্রতিটি মানুষের জন্য এতো বড় একটা গর্ব ইতিহাসের পক্ষপুট থেকে বেরিয়ে আসবে প্রকাশ্য দিবালোকে। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ঘোষণা করলেন, ভুল হলো, মানব সভ্যতার ইতিহাস যেন শ্রীমতী গান্ধীর কণ্ঠের মাধ্যমে জানিয়ে দিল: বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র ভারত স্বীকার করছে, বরণ করছে বিশ্বের কনিষ্ঠতম স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাকে। সেই মুহূর্তে চিৎকার করে আকাশ ফাটিয়ে বলতে ইচ্ছে করছিল, আমার ভয় ভীরুতা সংকোচ—মিথ্যা, আমার সবকিছু মেনে নেওয়ার, অন্যায়কে বরদাস্ত করবার প্রবণতা—মিথ্যা। সত্য—আমি আছি, আমি থাকব। প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্তে, আমার জন্যে, তোমার জন্য সকল মানুষের জন্য লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে আমি বেঁচে থাকব। অসংখ্য ধন্যবাদ, কোটি কোটি ধন্যবাদ আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে, যিনি আমাদের সমস্ত রকমের

অসম্মানের পর্দাটাকে ছিন্ন করে স্বাধীন সূর্যালোকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, কোটি কোটি হৃদয়ের ভাষাকে নিজের ঘোষণায় রূপ দিয়েছেন।

ভারতবর্ষের ঐতিহ্য এক হিসেবে স্বীকৃতির ঐতিহ্য। ভারত স্বীকার করেছে মানুষই অমৃতের পুত্র ; ভারত স্বীকার করেছে প্রতিটি মানুষের অধিকারকে ; ভারত স্বীকার করেছে প্রতিটি মানুষের নিজস্ব সত্তায় ফুটে ওঠার, পুষ্পিত হওয়ার অধিকারকে। বাংলাদেশের মানুষকে তাঁদের মুক্তি-সংগ্রামকে স্বাধীনভাবে মাথা তুলে দাঁড়াবার অধিকারকে স্বীকার করে আমরা প্রমাণ করেছি আমরা ঐতিহ্যচ্যুত ছিন্নমূল নই। আমরা দূর থেকে মানবিক মুক্তির কথার বেলুন ওড়াই না। আমরা সমৃদ্ধির স্বর্গে বাস করে নির্যাতীত নিপীড়িত মানুষের কান্নার সুর নিয়ে বেহালা বাজাই না। আমরা গণতন্ত্রের নামাবলী গায়ে জড়িয়ে গণহত্যাকে প্রশ্রয় দিই না। আমরা মুক্তিকামী মানুষের সংগ্রাম-সাথী হই, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করি।

আমরা আমাদের স্বাধীনতা কুড়িয়ে পাইনি, অর্জন করেছি, শত শহীদের রক্তের বিনিময়ে তাকে জয় করেছি। আমরা জানি, স্বাধীনতা মানে, বৃহত্তর কঠিন সংগ্রাম, স্বাধীনতার মর্যাদা রক্ষার, স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করার।

বাংলাদেশকে স্বীকৃতি জানিয়ে আমরা প্রমাণ করেছি—আমাদের নিরঙ্কুশ স্বাধীনতায়, আমরা কাউকে হস্তক্ষেপ করতে দেব না। যে আমেরিকা কিউবা-সোভিয়েট সহযোগিতাকে নিজের সীমান্তের বিপদ ভেবে, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঝুঁকি নেয়, যে-আমেরিকা গণতন্ত্র বাঁচাবার নাম করে ভিয়েৎনামে সৈন্য পাঠায়, সেই আমেরিকা যখন পাকিস্তানের বর্বর আক্রমণের প্রকৃত তথ্য জেনেও আক্রান্তকে দোষারোপ করে, কিংবা যে-চীন আন্তর্জাতিক মুক্তি সংগ্রামের নেতা সেজে ঘরের কাছে কাম্বোডিয়ার প্রিন্স নরোদম সিহানুককে নিজের দেশে আশ্রয় দিয়ে তার সরকারকে স্বীকৃতি জানায়, দেশে দেশে

বিপ্লবের বাণী রপ্তানী করে অথচ সেই চীনই যখন বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি 'মানুষের মহান মুক্তি সংগ্রামকে ব্যঙ্গ করে, লক্ষ লক্ষ শহীদের প্রাণ-দানকে ঠাট্টা করে, ইয়াহিয়ার জঙ্গীশাহীর সঙ্গে হাত মেলায়, তখন বলতে ইচ্ছে করে—ভাগ্যিস গোটা বিশ্বই আমেরিকা হয়নি, চীন হয়নি। তাই আশা জাগে মানব সভ্যতা হয়তো শেষ পর্যন্ত অবিকৃতই থেকে যাবে।

শুনেছি, বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবার খবরে ক্ষিপ্ত হয়ে চীন বলেছে ভারত সম্প্রসারণবাদী, আমেরিকা বলেছে, ভারতকে দেয় সাহায্যের মোটা অংশ কেটে দিচ্ছি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন-লাই, সবিনয়ে বলছি: ঠিকই বলেছেন, আমরা সম্প্রসারণবাদী, তবে, আমাদের লোভ সাম্রাজ্যের নয়, মানুষের মুক্তির সাম্রাজ্যের।

মাননীয় প্রেসিডেন্ট নিক্‌সন্, আপনাকেও বলছি, যদি ভেবে থাকেন আপনার সাহায্য দিয়ে আপনি আমাদের স্বাধীনতাকে ক্রয় করবেন, তবে ভুল করেছেন। লিংকন জেফারসনের দেশকে যদি আজ বোঝাতে হয়, টাকা দিয়ে জঙ্গীশাহীকে কেনা গেলেও, স্বাধীনতাকে কেনা যায় না, তবে তারচেয়ে লজ্জার আর কী থাকতে পারে। আমরা আপনাদের জানিয়ে দিতে চাই,—ভয় দেখিয়ে, লজেন্স দিয়ে, কিছুদিন খোকাকে বশ করা গেলেও, সে যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হয়, তখন সে সঙ্গীনধারী, স্বাধীনতার অতন্দ্র প্রহরী হয়ে ওঠে, ভয়ের বিরুদ্ধে লড়াই-ই, তার ধর্ম হয়। বাংলাদেশকে, বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের তেজোদ্দীপ্ত সংগ্রামকে স্বীকৃতি দিয়ে আমরা নিজেকে, নিজের শক্তিকে জেনেছি। তাই আজ গলা ফাটিয়ে, একথা বলবার যোগ্যতা অর্জন করেছি, শত্রুরা সব শোন: এ দেশ আমার গর্ব, এ মাটি আমার কাছে সোনা।

অত্যাচারীর খড়গ কৃপাণকে আমি ভোঁতা করে দিয়েছি, স্বৈর-তন্ত্রের দুর্ভেদ্য দুর্গটা আমি ভেঙ্গে চুরে, চুরমার করে দিয়েছি, প্রয়োজন

হলে এক নদী রক্ত দেবার অঙ্গীকার ছিলো তাও পূরণ করেছি। আমি এক রণক্লান্ত সৈনিক—স্বাধীনতার সূর্যটাকে ছিনিয়ে আনবার পর মুক্ত, আমি স্বাধীন। আমি মানসচক্ষে ঢাকার বুকে দাঁড়িয়ে ছবি দেখছি—শহীদ-মিনারটা পশু শক্তির দুঃসহ স্পর্ধার আঘাতে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেছে, কিন্তু পলাশের কুঁড়িতে দেখো : সেই ৫২'-র লাল আজও রয়ে গেছে অম্লান। আমি ছবি দেখছি—ছোট্ট ছেলে আসাদের বুকের "রক্তে" ভেজা সার্টটা আজও কি করে যেন পতাকা হয়ে হাতে হাতে উড়ছে। আমি ছবি দেখছি—পল্টনের ময়দানের এখানে-ওখানে, এখনও ছড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য মৃত মানুষের হাড়। ভাল করে তাকাও, দেখবে—আবার পল্টনের ময়দানে জনসমুদ্রের জোয়ার এসেছে, লক্ষ লক্ষ মুষ্টিবদ্ধ হাত আকাশের ঔদ্ধত্যকে চূর্ণ করে মানুষের মহিমাকে বড় করে তুলেছে। আমি ছবি দেখছি নির্বাচনোত্তর বিজয়োল্লাসের, আমি ছবি দেখছি—৭ই মার্চে ইতিহাসের কম্বু-কণ্ঠ ঘোষণা : এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। অনেক পথ হেঁটেছি আমি, অনেক পথ। অনেক সংগ্রামের যন্ত্রণাকে বুকে তুলে নিয়েছি আমি, অনেক যন্ত্রণা। আজ আমি রণক্লান্ত সৈনিক এক। ইন্দিরা-বঙ্গবন্ধুর ছবির সামনে দাঁড়াই, দর্পণে ছায়া পড়ে, চমকে উঠি, কে এই দর্শক? আমি, না তুমি? তুমি, না আমি? আশ্চর্য আবিষ্কার : আমি তোর জন্ম-সহোদর।

আমি তোর জন্ম-সহোদর সংগ্রামে শান্তিতে, হাসিতে কান্নায়, রবীন্দ্র-নজরুলে এবং অ-আ-ক-খ বর্ণমালার বর্ণাঢ্য পতাকার নীচে—আমি তোর জন্ম-সহোদর। ঘরের দাওয়ায় লক্ষ্মীর পায়ের ছাপ দেখার আকুল আশায়, পীরের দরগায় মঙ্গলার্থীর প্রদীপ জ্বালানোয় তুমি আছ, তাই আমি আছি, আমি আছি, তাই তুমি আছ—এ এক আশ্চর্য আবিষ্কার, তোমার আমার সকল মানুষের জন্য।

মানুষের জীবন, বিন্দু থেকে বৃত্তে উত্তরণ। এক আশ্চর্য বৃত্ত সম্পূর্ণ হল ঢাকার সেই রেস কোর্স ময়দানে। ৭ই মার্চ এই রেস কোর্সে শেখ মুজিব ঘোষণা করেছিলেন: মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরও দেবো, এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো। বছর ঘুরতে পারেনি। সেই রেসকোর্স ময়দানে ১৬ই ডিসেম্বর জেনারেল নিয়াজী লিখেছেন—জেনারেল অরোরাকে: আমি ও আমার সৈন্যবাহিনী একসঙ্গে বিনাসর্তে আত্মসমর্পণ করছি। কাঁধ থেকে সামরিক চিহ্ন খুলে নিলেন জেনারেল নিয়াজী, জেনারেল অরোরার কপালে কপাল ছোঁয়ালেন। আত্মসমর্পণ পর্ব শেষ হল। বুড়িগঙ্গার তীরে তখন সূর্য ডুবছে নব অরুণোদয়ের অঙ্গীকার নিয়ে। সংগ্রাম শেষ হল।

আমার সংগ্রাম ছিল তোমার জন্য, তোমার সংগ্রাম, তাও আমার জন্য। কেননা দুই সংগ্রামের একই প্রাণবিন্দু—স্বাধীনতা, ধর্ম-নিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র। ৩৬৩ বছরের পুরনো নগরী ঢাকা আজ সদ্যজাত রাষ্ট্রের মুক্ত রাজধানী,—একাল ও সেকালকে মিলিয়ে যে-চিরকালের মানবিকতা, তারই প্রতিষ্ঠাভূমি। তোমার সংগ্রাম শেষ, তাই আমারও সংগ্রাম শেষ হল সুতরাং আর যুদ্ধ নয়, —এবার এ পৃথিবীকে যুদ্ধমুক্ত করার লড়াই।

পূর্বখণ্ডে তোমার আমার লড়াই শেষ হল। আমি তাই ঘোষণা করেছি - একতরফাভাবে ঘোষণা করেছি: পশ্চিমখণ্ডেও, লড়াই বন্ধ হোক, হোক যুদ্ধবিরতি। আমার লড়াই ভূখণ্ড অধিকারের লড়াই নয়, আমার লড়াই অপরের স্বাধীনতা অপহরণের লড়াই নয়, আমার লড়াই নয় সাম্রাজ্য বিস্তারের। পূর্বখণ্ডে মানুষের বাঁচার লড়াই-এ আমি সামিল হয়েছিলাম, আমি চেয়েছিলাম মানবিক মূল্যবোধকে, দরকার হলে, নিজের জীবন দিয়েও রক্ষা করতে। শত্রু তাই আমাকে বরদাস্ত করতে পারেনি, আক্রমণ করেছিল। পশ্চিম-খণ্ডে আমাকে তাই নামতে হয়েছিল প্রতিরোধ সংগ্রামে। পূর্বখণ্ড-

সংগ্রাম শেষে তাই পশ্চিমখণ্ড লড়াই-এর আর কোন দরকার রইল না। দরকার রইল না অপ্রয়োজনীয় অহেতুক রক্তপাতের। তাই, আর লড়াই নয়।

আমি স্বাধীনতা, গণতন্ত্রের সংগ্রামী, আমি এ যুগের শান্তিকামী বিশ্বমানবতার এক ক্ষুদ্র অংশ। আমার সঙ্গে তাই বিরোধ নেই পশ্চিম পাকিস্তানের কোটি কোটি মানুষের, যারা আমারই মত স্বপ্ন দেখে স্বাধীনতার—গণতন্ত্রের। কাজেই, আজ যুদ্ধ বিরতি।

আজ যুদ্ধ বিরতি,—কিন্তু সেই সঙ্গে আর এক লড়াই-এর সূত্রপাত। এ লড়াই-এও আমি তুমি একই কাতারে দাঁড়িয়ে লড়বো, লড়বো সমৃদ্ধির জন্য, শান্তির জন্য। লড়বো আমার ভারতের জন্য—লড়বো তোমার সোনার বাংলার জন্য।

আমারও মুক্তিযুদ্ধ

অন্নদাশংকর রায়

প্রথম পর্যায়ে এটা ছিল ওপারের জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নির্ধারিত দিবসে সম্মিলিত হয়ে সংবিধান রচনায় অহেতুক বাধাদানের উত্তরে অহিংস অসহযোগ তারপর অসামরিক প্রশাসনের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা। কেউ আমাদের হস্তক্ষেপ চায়নি, আমরাও অনাহূত হয়ে হস্তক্ষেপ করিনি, দূর থেকে তটস্থ হয়ে অবলোকন করেছি, মনে মনে তারিফ করেছি।

দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয় স্মরণীয় পঁচিশে মার্চ তারিখে। সেদিন সকালে উঠে খবরের কাগজ পড়ে আমার ধারণা হয়েছিল প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে শেখ মুজিবর রহমানের কথাবার্তা সফল হতে চলেছে, আজকেই মিটমাট হয়ে যাবে। মিষ্টান্ন আনিয়ে ঘটনাটিকে সেলিব্রেট করব ভেবেছিলুম। কিন্তু রেডিও পাকিস্তান যতবার খুলি ততবার নীরব। বুঝতে পারিনি কী ব্যাপার। মনটা ভরে যায় উদ্বেগে। কিন্তু কেন উদ্বেগ তাও বলতে পারিনে। রাত্রে শুতে গিয়ে ছটফট করি। কেউ আমাকে জানতে দেয় না কী প্রলঙ্কয়কর কাণ্ড চলেছে রাতভোর ঢাকায় ও অন্যান্য শহরে। সকালবেলায় পড়ি ও যা শুনি, তা সম্পূর্ণ অভাবিতপূর্ব। মিলিটারি অ্যাকশন! সেইদিনই রেডিওতে প্রচার করা হয় বাংলাদেশ স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে। সেটা আর রেডিও পাকিস্তান নয়। ঢাকা বেতার কেন্দ্র। অভাবিতপূর্ব ও অভিনব সংঘটন। বিপ্লব আর কাকে বলে! বেধে যায় অহিংসা সংগ্রাম।

দ্বিতীয় পর্যায়ে আমরা কি নিষ্ক্রিয় থাকতে চাইলেও নিষ্ক্রিয়

থাকতে পারি? নৈতিক সমর্থন জানাই, সীমান্তে গিয়ে সেবাশুশ্রূষার ব্যবস্থা করি। যদি কেউ সীমান্ত পার হয়ে মুক্তিসংগ্রামে অংশ নিতে চান তবে তাঁর সেই ব্যক্তিগত প্রয়াস্ অনুমোদন করি, কিন্তু রাষ্ট্রহিসাবে অপর রাষ্ট্রের ঘরোয়া ব্যাপারে হস্তক্ষেপ অনুমোদন করিনে। তা করতে গেলে দেশ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে আর যুদ্ধ জিনিসটা ঝোঁকের মাথায় করবার মতো কাজ নয়।

সীমান্তের ওপারে যে সব পৈশাচিক কাণ্ড অনুষ্ঠিত হচ্ছিল, তার খবর পৃথিবীময় ছড়িয়ে গেল। বিদেশী, সাংবাদিকরাই প্রকাশ করে দিলেন। ওপার থেকে যাঁরা ওপারে এলেন, সেই সব প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ শুনে গভীরভাবে বিচলিত হলুম। মানুষ যখন রাক্ষস হয়, তখন রাক্ষসকেও ছাড়িয়ে যায়। আমাদের মনে সন্দেহ রইল না যে সুপরিকল্পিতভাবে বাঙালী জাতিকে পাকিস্তানে সংখ্যা-লঘুতে পরিণত করা হচ্ছে। যাদের মৃত্যু অবধারিত তারা যদি পালটা মার দেয়, সেটা নিশ্চয়ই অন্যায় নয়। যারা মারবেও না, মরবেও না, তাদের পালিয়ে আসাটাও অস্বাভাবিক নয়। ভারত ছাড়া কোথায়ই বা তারা যাবে! দেশ ছেয়ে গেল শরণার্থীতে। গোড়ার দিকে যারা এল তাদের অধিকাংশই মুসলমান। পরে যারা এল তাদের অধিকাংশই হিন্দু। বোঝা গেল বাংলাদেশকে হিন্দুশূন্য করে পাঞ্জাবের অনুরূপ করা হচ্ছে।

পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার হস্তক্ষেপ করব না, সেটা ঠিক। তা বলে এটাও কি ঠিক যে, পাকিস্তানে বাঙালীমাত্রেই হবে সংখ্যালঘু, হিন্দুমাত্রেই হবে নির্মূল? এ ধরনের ব্যাপার জারমানিতে ঘটলে দুনিয়ার লোক প্রতিকার করতে ছুটে যায়, কিন্তু শত আবেদন নিবেদন পরও দেখা গেল বিশ্ববিবেক অকর্মক। সকর্মক তা হলে হবে কে? ভারত, আবার কে! কিন্তু কীভাবে সকর্মক হবে? এই জিজ্ঞাসা আমাদের সবাইকে প্রতিনিয়ত অস্থির করে তোলে। গান্ধীবাদীরাও বলতে আরম্ভ করেন যে,

শুধুমাত্র সেবাশুশ্রূষা করে কোনো ফল হবে না। ওপারে গিয়ে লড়তে হবে। অহিংসভাবে সম্ভব না হলে সহিংসভাবে। কিন্তু লড়বে কে? কোথায় অস্ত্র? কোথায় তালিম? কোথায় সংগঠন?

ধীরে ধীরে উপলব্ধি করা গেল যে, বাংলাদেশের মুক্তি যোদ্ধাদেরই অস্ত্র জোগাতে হবে, তালিম করতে হবে। সংগঠিত করতে হবে। এ সব কাজ ব্যক্তিগত বা দলগতভাবে করা যায় না। করতে হবে রাষ্ট্রগতভাবে। হ্যাঁ দরকার হলে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হবে ভারতকে। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে মাসের পর মাস কেটে যায়। ততদিনে কয়েক লক্ষ লোক নিপাত। ষাট সত্তর লক্ষ লোক উৎখাত।

এমন সময় শোনা গেল পাকিস্তান বলছে সে যুদ্ধে নামবে, তার পেছনে না কি অন্যেরা আছে, সে নিঃসঙ্গ নয়। একথা শোনার পর কে নিশ্চিন্ত থাকতে পারে! রাতারাতি সোভিয়েটের সঙ্গে চুক্তি করতে হলো। না করলে ভারত যুদ্ধ করতে অনিচ্ছুক হতো। পাকিস্তান তার সুযোগ নিয়ে আরও কয়েক লক্ষকে নিপাত করত, আরও চল্লিশ পঞ্চাশ লক্ষকে উৎখাত করত।

রাজনৈতিক সমাধানের আশা অনেক দিন পর্যন্ত দুনিয়াকে নিশ্চেষ্ট রাখে। ক্রমে বোঝা গেল রাজনৈতিক সমাধান বলতে বোঝায় সংখ্যাগুরু রাজনৈতিক দলকে সংখ্যালঘুতে পরিণত করা ও সংখ্যালঘু রাজনৈতিক দলগুলিকে একত্র করে সংখ্যাগুরুতে পরিণত করা। তার জন্যে বহুলোকের নাম কেটে দিয়ে উপনির্বাচনের উদ্যোগ হলো, পরে দেখা গেল উপনির্বাচন মাত্রেই একতরফা। নতুন লোকদের নিয়ে যে সব সরকার গঠন করা হবে সেটা অসামরিক হতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সংখ্যালঘু দলগুলির সরকার। এমনতর সরকার কি শরণার্থীদের অভয় দিতে পারে? বিশেষত যে সব সাম্প্রদায়িকতাবাদী দল হিন্দুদের উৎসাদনে সহায়তা করেছে ও ভিন্নপন্থী মুসলমানদেরও দেশ থেকে তাড়িয়েছে।

কেবল ভারতের মতে নয়, আরও অনেকের মতে রাজনৈতিক সমাধানের অর্থ শেখ মুজিবের প্রাণরক্ষা ও মুক্তি তারপরে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা ও বোঝাপড়া। অন্যান্য দেশের সঙ্গে ভারতের তফাৎ এইখানে যে ভারতের মতে এটা জরুরি। আর একটা দিনও সবুর করা চলে না। রাশিয়াও ভারতের সঙ্গে একমত হয়, তবে যুদ্ধে নামতে উৎসাহ দেয় না, বরঞ্চ বেশ কিছু দেরি করিয়ে দেয়। তার যথেষ্ট কারণ ছিল। যুদ্ধ বাধলে বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হতে পারে। এত বড় দায়িত্ব কি চোখ বুজে নেওয়া যায়?

দেশের লোক হাজার বার বললেও ভারত সরকার পেছপাও হন। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী ইউরোপ আমেরিকায় গিয়ে সমস্যাটার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কিন্তু সফল হলেন কতদূর তা বলা যায় না। তবে লাভ এইটুকু হলো যে ফ্রানসকে ও ব্রিটেনকে নিরাপত্তা পরিষদে নিরপেক্ষ ভূমিকা নিতে দেখা গেল। আজকের খবর ফ্রান্স ও ব্রিটেন রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদেও নিরপেক্ষ ভূমিকা নিয়েছেন।

ইতিমধ্যে যুদ্ধ বেধে গেছে। পঁচিশে মার্চের মতো স্মরণীয় দিবস ৬ ডিসেম্বর। এই তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী সমাজবাদী ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বাংলাদেশ ভারতের স্বীকৃতি লাভ করেছে। এখন থেকে তৃতীয় পর্যায় শুরু। এখন এটা আর পাকিস্তানের ঘরোয়া ব্যাপার নয়। রীতিমতো আন্তর্জাতিক ব্যাপার। ভারত ও পাকিস্তান নামক দুই রাষ্ট্রের যুদ্ধ তো বটেই, উপরন্তু পাকিস্তান ও বাংলাদেশ নামক দুই রাষ্ট্রের যুদ্ধ।

রাষ্ট্রসংঘে যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব পাস করা হয়েছে। এ প্রস্তাব মান্য করা উচিত, কিন্তু ভারত পাকিস্তান মান্য করলেও বাংলাদেশ মান্য করলেও বাংলাদেশ মান্য করবে না। কারণ সে তো রাষ্ট্রসংঘের সদস্য বা স্বীকৃত রাষ্ট্র নয়। যুদ্ধবিরতির পরের ধাপ তো শান্তি বৈঠক। যে বৈঠকে বাংলাদেশ থাকবে না, শেখ মুজিবর থাকবেন না সে বৈঠক আদৌ বসবে কিনা সন্দেহ। কারণ ভারত একবার

বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবার পর আর ফিরিয়ে নিতে পারবে না। এটা এমন একটা পদক্ষেপ যা প্রত্যাহার করা অসম্ভব।

প্রথম তথা দ্বিতীয় পর্যায় যেমন সরল ছিল তৃতীয় পর্যায়ে তেমন নয়। পাকিস্তান ইচ্ছা করেই পশ্চিম প্রান্তে আর একটা ফ্রনট খুলেছে, যাতে কাশ্মীরকেও বাংলাদেশর সঙ্গে জড়ানো যায়। ভারত যদি বাংলাদেশে এগিয়ে যায় সেও কাশ্মীরে এগিয়ে যাবে। .তাকে সেখান থেকে হটাতে না পারলে যুদ্ধবিরতিটা তার পক্ষে লাভজনক হবে। শান্তি বৈঠকে তার হাতে তুরুপের তাস থাকবে। সে বলবে বাংলাদেশ যদি স্বাধীন হয় কাশ্মীরও স্বাধীন হবে। বাংলাদেশে যদি প্লেবিসাইট হয় কাশ্মীরেও প্লেবিসাইট হবে।

তৃতীয় পর্যায়ই কি শেষ পর্যায়, না এর পরে চতুর্থ পর্যায় আসছে? যে পর্যায়ে ভারত পাকিস্তানের বাইরে যাঁরা আছেন, তাঁরাও এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বেন? কে জানে, কার সঙ্গে পাকিস্তান কী গোপন চুক্তি করেছে। চুক্তিবদ্ধ মানে অঙ্গীকারবদ্ধ। পাকিস্তানের বিপাকে তার দোস্তরা রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদে ১০৪টি ভোট পাইযে দিয়েছেন। আর ভারতের বন্ধুরা ভারতকে পাইয়ে দিয়েছেন মাত্র ১১টি। দশটি দেশ ভোটদানে বিরত পাঁচটি অনুপস্থিত। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে তাঁরা জাতীয় স্বার্থে চুক্তিবদ্ধ হয় ও যুক্তি অনুসারে নয়। বিবেক অনুসারে নয়।

সেইজন্যে জোর করে বলতে পারা যাচ্ছে না, চতুর্থ পর্যায়ে কী আসছে। বৃহত্তর যুদ্ধ না চূড়ান্ত মীমাংসা। এমনও হতে পারে যে, কোনোটাই আসছে না, আসছে অচল অবস্থা। সামরিক ও রাজনৈতিক সেটেলমেনট। পাকিস্তানের হাতে আরও একখানা তুরুপের তাস আছে, সেটা সে খেলবে কাশ্মীর না পেলে ও বাংলাদেশ হারালে। সে তার নিজের দখলী জায়গার বিদেশী ঘাঁটি গেড়ে বসতে দেবে। সেটা হবে তার ঘরোয়া ব্যাপার। ঘরোয়া ব্যাপারে কেই বা হস্তক্ষেপ করতে যাচ্ছে? গেলে নতুন এক যুদ্ধ।

আমি যতদূর দেখত পাচ্ছি পাকিস্তানের সামরিক গোষ্ঠী ও তাদের বিভিন্ন মিত্রগোষ্ঠী ভারতকে শান্তিতে থাকতে দেবে না। বাংলাদেশকেও নিষ্কণ্টক হতে দেবে না। আর একটা যুদ্ধ হয়তো বাধবে না কিন্তু ঠাণ্ডা লড়াই বহুকাল ধরে চলবে। একমাত্র সুখের কথা ভারত আর বাংলাদেশ এখন থেকে অভিন্নহৃদয় বন্ধু। এ বন্ধুতা অটুট। বাংলাদেশের দুর্দিনে ভারত তার জন্যে যা করেছে আর কেউ তা করেনি বা করতে পারত না। পাকিস্তানীরা আরও কিছুকাল থাকলে আরও কত হাজার লোক মারত, আরও কত হাজার নারীর সম্মানহানি করত, আরও কত লক্ষকে নির্বাসনে পাঠাত। ভারত এই সব পুরুষকে প্রাণে বাঁচিয়েছে, এই সব নারীর মান বাঁচিয়েছে, এই সব মানুষকে ঘরবাড়ি জমিজমা ফেলে নির্বাসনে যাবার দুর্ভাগ্য থেকে বাঁচিয়েছে।

উপরন্তু বাঁচিয়েছে তার নিজের রাষ্ট্রের সংখ্যালঘুদের সাম্প্রদায়িকতা-বাদী জনতার হাত থেকে। জনতা আর বেশি দিন ধৈর্য ধরত বলে মনে হয় না। সাম্প্রদায়িকতা এখন চিরতরে গেল। আর সে অধ্যায়ের পুনরাবৃত্তি হবে না। ওই নিয়ে আমার প্রবন্ধ লেখাও ফুরোল। গান্ধীহত্যার পর যে দায় আমি স্বেচ্ছায় নিজের কাঁধে-তুলে নিয়েছিলুম আজ আমি সে দায় থেকে মুক্ত। এ যুদ্ধ আমারও মুক্তিযুদ্ধ।

শরিক ও সৈনিক

মনোজ বসু

পৃথিবীর নবীনতম গণতন্ত্র—গণতন্ত্রী বাংলাদেশ। রক্ত-সাগরে অবগাহন করে সর্ব গ্লানি পাপ বিমুক্ত হয়ে উঠে এলো। প্রথম স্বীকৃতি দানের গৌরব ভারতের। আমাদের ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী। একই ঐতিহ্যের অধিকারী আমরা—চব্বিশটা বছর আগে আমাদের দেশ ছিল একটাই। দুটি পৃথক রাষ্ট্র হয়েও আমরা একাত্ম আমাদের রাষ্ট্রিক আদর্শ সর্বতোভাবে এক। নব রাষ্ট্রকে আমি অভিনন্দন ও অভিবাদন জানাই।

ভারতীয় জওয়ানেরা বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীর পাশাপাশি লড়ছে। মুক্তিবাহিনী আর মিত্রবাহিনী। লড়াই আমরা একেবারেই চাইনি। নানা সমস্যার নিরসন করে দেশকে সকল দিক দিয়ে পরিপাটি করে গড়ে তুলব—গরিবি হঠাব—সর্বপ্রযত্নে আমরা সেই আয়োজনে ছিলাম। বলদৃপ্ত জঙ্গীশাহী বাংলাদেশ উৎসাদনের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ল। ঘরের পাশের মানুষের এ দুর্দৈবে পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্র ভারত 'পাকিস্তানের ঘরোয়া ব্যাপার বলে অন্যান্যদের মতো নিরাশক্ত দৃষ্টিতে পাশ কাটিয়ে যেতে পারেনি। ইসলামাবাদের বড় আক্রোশ সেইহেতু আমাদের উপর। সীমান্ত তছনছ করেছে—আগে থেকেই এক পরোক্ষ অভিযান চালিয়ে আসছে আমাদের বিপক্ষে। আরণ্য হিংস্রতায় প্রায় এক কোটি মানুষকে ঘর ছাড়া করেছে, তাঁদের একমাত্র অপরাধ গণতন্ত্রের উপর প্রীতি—গণতন্ত্রের স্বপক্ষে তাঁরা ভোট দিয়েছিলেন। প্রাণের আতঙ্কে সর্বস্ব ফেলে তাঁরা ভারতের শরণার্থী হলেন। এই বোঝা ভারত আট মাস ধরে টানল, যার ফলে

অর্থনীতি বানচাল হতে বসেছে গঠন পরিকল্পনা সিকেয় উঠে গেছে। এই শতকের নৃশংসতম গণহত্যা ও গণতন্ত্রহত্যার যাবতীয় বিবরণ বাংলাদেশের মানুষ পৃথিবীর দরজায় দরজায় ঘুরে জানিয়ে এসেছেন। এবং আমরাও। খুব তারিফ পেয়েছি আমরা, ভারত সহিষ্ণুতার পরাকাষ্ঠা দেখাচ্ছে—আজ যাঁরা উল্টো সুরে গাইছেন তাঁরা পর্যন্ত শতকণ্ঠে বাহবা দিয়েছেন। কিন্তু একমাত্র সোভিয়েত রাশিয়া ছাড়া বৃহৎ শক্তি কারো কাছ থেকে বলিষ্ঠ সাহায্য ও প্রতিশ্রুতি মিলল না। গণতন্ত্র নিয়ে মস্ত মস্ত বুলি যাঁদের মুখে, তাঁদের কাজকর্মে হতবুদ্ধি হয়ে যাচ্ছি। নিজ স্বার্থের কড়াক্রান্তির হিসাব করে হত্যাকারীর হাতে হাত মেলাতে একটুও দ্বিধা নেই তাঁদের। এবং এই বাবদে ছলেরও অসদ্ভাব ঘটে না।

বিস্তর অপেক্ষা পরে সকল দায় অবশেষে নিজেরাই কাঁধে তুলে নিলাম। কারো চোখ-রাঙানি বা পিঠ-চাপড়ানির তোয়াক্কা না রেখে অটল আত্মপ্রত্যয়ে আমরা বর্বরতার বিরুদ্ধে অভিযানে নেমেছি। গণতন্ত্র রক্ষায় আমাদের জওয়ানরা বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সহযাত্রী। শরণার্থীরা সসম্মানে দেশে ঘরে ফিরবেন সে পথ তাঁরাই প্রস্তুত করে দিচ্ছেন। ফেরা আরম্ভ. হ'য়ে গেছে ইতিমধ্যে। আতঙ্কে অর্দ্ধমৃত অবস্থায় ধুঁকতে ধুঁকতে একদিন এসেছিলেন—তাঁদের মুখ হাসিতে উজ্জ্বল, দৃঢ় পায়ে পরিজনদের আগুপিছু নিয়ে ফিরে চলেছেন। সীমান্তে দাঁড়িয়ে মানুষের পুনর্জীবনের এই দৃশ্য দেখে দেখে আর আশ মেটে না। মানবিকতা নিয়ে এতাবৎ কত ভাষাবিন্যাস করেছি, কত শত কল্পনা লালন করেছি মনে মনে। আমাদের এ যুদ্ধ সেই মানবিকতার আহ্বানে। ঐতিহ্যবান ভারতবর্ষের প্রতি আমি মাথা নোয়াই কিন্তু এই উনিশ-এ-একাত্তরের ভারতের জন্য আমার গর্বের সীমা পরিসীমা নেই। কোনপ্রকার বৈষয়িক লাভ ভারতের লক্ষ্য নয়। জঙ্গীশাহীর কবল থেকে একটি অঞ্চল যেইমাত্র উদ্ধার হল, গণতান্ত্রিক ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা সঙ্গে সঙ্গে সেখানে

সাংগঠনিক কর্মে লেগে যাচ্ছেন। এই জিনিসটাই ইয়াহিয়ার ব্যবস্থাপনায় হবে, প্রত্যাশা করা গিয়েছিল। এবং ইয়াহিয়ার মুরুব্বিদের ধরে এই পরামর্শই বার বার তাঁর কাছে পাঠানো হয়েছে, তিনি কর্ণপাত করলেন না। ফলে যুদ্ধ। যুদ্ধ-বিজয়ের প্রাপ্তিটা ভারতের একলা নয়, সমস্ত মানব-সমাজের। বিশ্ববিবেক নাম বস্তুটির অস্তিত্ব সম্বন্ধে সকলে সন্দিহান হয়ে উঠেছিলাম, তৎসম্পর্কে আস্থা ফিরে আসবে।

এ লড়াই জিতবই। নইলে সভ্যতার অগ্রগমন অনেক শতাব্দী পিছিয়ে যাবে। শুরু থেকেই নানা ফ্রণ্টে বিজয়বার্তা আসছে। উল্লসিত নিশ্চয়ই হব, কিন্তু আত্মহারা না হই। অনেক চক্রান্ত পিছনে, গণতন্ত্রের উষ্ণীষধারী গণহত্যার সমর্থক অনেক আছে। নানা অনর্থের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে, পতন-অভ্যুদয় অনেকবার ঘটবে। স্বার্থসন্ধ কত বহুরূপী আরও কতবার রং পাল্টাবে, ধারণায় আসছে না। পূর্ণ বিজয়ের জন্য এখনও অনেক রক্ত ঢালতে হবে।

য়ুরোপীয় ও মারকিনী অনেক লেখক লড়াইয়ের মধ্যে কলম ফেলে হাতিয়ার ধরেছেন। বিদেশের যুদ্ধেও স্বেচ্ছাসৈনিক হয়ে গেছেন। আদর্শ সাধনের জন্য নানা পন্থায় সমর প্রচেষ্টার সহায়ক হয়েছেন। তারা আত্মদান করেছেন, অথবা লড়াইয়ের পর ফিরে এসে সাহিত্যকে সমৃদ্ধিতে ভরে দিয়েছেন। চীনের মুক্তিসংগ্রামের মধ্যেও মাও-তুন প্রমুখ বাঘা-বাঘা সাহিত্যিক ঝাঁপিয়ে পড়ে অশেষ দুঃখ-লাঞ্ছনা-নির্যাতন সয়েছেন, তার চমকপ্রদ বিবরণ সেই সব লেখকের নিজ মুখের বর্ণনায় কিছু কিছু শুনে এসেছি। এ যুদ্ধেরও অন্যতম শরিক বলে নিজেকে আমি ভাবি—জলে স্থলে আকাশে যাঁরা লড়ছেন, তাঁদের সমগোত্রিয় সৈনিক। সংবাদপত্র ও রেডিওর খবরগুলির উপর বাহবা দিয়ে গেলেই হবে না, হাতে-কলমে কাজ করার প্রবল তাড়না অনুভব করছি। কলম ছাড়াও হাতের কাজ রয়েছে। আসমুদ্র-

হিমাচল আজ একটি মাত্র স্বরে কথা বলছে, এমন সংহত বলিষ্ঠ ভারত আমার দীর্ঘ-জীবনের মধ্যে আর কখনো দেখেনি।

বিশেষত বাংলাদেশের এই মুক্তিসংগ্রামের অগ্রনায়ক বাংলা ভাষা বাংলা সাহিত্য ও বঙ্গ সংস্কৃতি। চব্বিশ বছর আগে এক বাংলা দুই বাংলা হল। সেটা রাজনৈতিক খণ্ডন, সাংস্কৃতিক খণ্ডন কোনমতেই সম্ভব হল না। তার জন্য ক্রমাগত চেষ্টা চলেছে পাকিস্তানী উপর মহলে। গোড়ায় পূর্ব বাংলা থেকে বাংলা ভাষা উৎসাদনের চেষ্টা। এই বাবদে পাকিস্তানের সেই গোড়ার আমলে ১৯৪৮ অব্দে জিন্নাহ্‌কে মুখোমুখি অপমান করতেও ছাত্রেরা ছাড়েনি। ভাষা নিয়ে বেধে গেল, মাতৃভাষার জন্য বাংলাদেশের ছেলেরা গুলির মুখে আত্মদান করলেন। পৃথিবীর মধ্যে তাঁরাই প্রথম ভাষা-শহীদ। ভাষা যুদ্ধে পরাজয়ের পরেও ক্রমাগত চক্রান্ত চলল। বাংলা হরফের জায়গায় আরবি হরফ চালু করা, বাংলার সঙ্গে অন্তত চল্লিশ পারসেণ্ট উরদু মিশাল দিয়ে ওপারের জন্য পৃথক এক বাংলাভাষা বানানো, রবীন্দ্র-সঙ্গীত নিষিদ্ধকরণ, ইত্যাদি ইত্যাদি। এপারে ওপারে বই পত্রের চলাচল একেবারে বন্ধ—পরস্পরের মনের খবর যাতে জানা না যায়। কত রকম করে দেখল। দুই বাংলার সাংস্কৃতিক শক্তি ইসলামাবাদ জানে, ভয় করে। তাই মাস আষ্টেকের এই স্বল্পকালীন পাশব শাসনের মধ্যেও সাইনবোর্ড, গাড়ির নম্বর, নেমপ্লেট ইত্যাদিতে তাড়াতাড়ি বাংলা হরফ পাল্টে উরদু বসিয়ে দিয়েছে—বাংলা ভাষা লোকের যাতে নজরে না পড়ে।

কয়েকজন শিল্পী-সাহিত্যিক আমরা বাংলাদেশের নেতাদের কাছে পুষ্পোপহার নিয়ে গিয়েছিলাম। বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম প্রতিভাষণে ভাষা-সংস্কৃতি শিল্প-সাহিত্যের জন্য তাঁদের সুদীর্ঘ সংগ্রামের কথাই বিশেষ করে বললেন। এই সংগ্রামের বিজয়লাভ বাঙ্গালী-সংস্কৃতি বিজয়—রাজনীতির অনেক উপরে তার জায়গা। নতুন বাংলাদেশের কেবল বীর্য ও সমৃদ্ধি হলেই

হবে না, তাকে শ্রীমণ্ডিত সুন্দর করে গড়ে তুলতে হবে। এই কর্মে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি উভয় বাংলার লেখক-শিল্পীদের মিলিত উদ্যম কামনা করলেন। গণতন্ত্রী বাংলাদেশের জন্মক্ষণে আজ আমাদের কঠোর আত্মসমীক্ষারও প্রয়োজন আছে। এক দেশ কেন দুটো দেশ হয়ে গেল? এক-হাতে কখনও তালি বাজে না—রাজনীতির চশমা না পরে মুক্তদৃষ্টি নিয়ে ধীর-স্থিরচিত্তে আমরা নিজ নিজ দোষ অনুধাবন করব। দুই দেশের মধ্যে বিরোধ ও রক্তক্ষয় কি জন্য ঘটেছিল? পাপের প্রায়শ্চিত্ত অনেক হয়েছে—এমনি সর্বনাশ আর যেন কখনও না ঘটে—এই যুদ্ধই যেন ভারতের পক্ষে শেষ যুদ্ধ হয়।

তোমারই হোক জয়

দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্ম আমার সার্থক, এ জীবন আমার ধন্য। আমারই চোখের সামনে অমানুষিক যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে ভূমিষ্ঠ হল এক নতুন জাতি, স্বভূমিতে প্রতিষ্ঠা পেলো এক নবীন রাষ্ট্র: বাংলাদেশ। দেখলাম, আমারই মত কষ্টক্লিষ্ট মানুষেরা কেমন ক'রে রক্তের তেরো নদী পেরিয়ে স্বাধীনতার সূর্যটাকে ছিনিয়ে আনলেন। দেখলাম, আমারই প্রতিবেশী মানুষের সংঘশক্তির প্রবল আঘাতে জঙ্গীশাহীর চব্বিশ বছরের দুঃশাসনে কেল্লাটা কেমন ক'রে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ধূলোয় মিশে গেল। দেখলাম, স্বজন-হারানোর শোকে কেমন ক'রে চোখে চোখে প্রতিশোধের আগুন হয়ে জ্ব'লে ওঠে। দেখলাম, বন্ধনমুক্তির স্পৃহা কেমন ক'রে ধর্মান্ধতার বেড়া উপড়ে ফেলে একটা জাতিকে একতাবদ্ধ করে। দেখলাম, বলিষ্ঠ অকপট নেতৃত্ব কেমন ক'রে নিতান্ত নিরীহ ছাঁ-পোষা মানুষগুলোকেও অকুতোভয় ক'রে তোলে, ভাষা-আন্দোলনকে মুক্তি সংগ্রামের রক্তাক্ত পথ অতিক্রম ক'রে পৌঁছে দেয় স্বাধীনতার ধ্রুব লক্ষ্যে। দেখলাম, মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত মানুষের নিঃশঙ্ক প্রতিরোধে কেমন ক'রে ভোঁতা হয়ে যায় বর্বর আক্রমণকারীর শাণিত অস্ত্রগুলো। দেখলাম, একটা লাঞ্ছিত শোষিত জাতির অগ্নিশপথ কেমন ক'রে গর্জে ওঠে কবিতার ছত্রে:

দিয়েছি তো শান্তি, আরও দেবো স্বস্তি,
দিয়েছি তো সম্ভ্রম, আরও দেবো অস্থি,
প্রয়োজন হ'লে দেবো এক নদী রক্ত,
হ'ক না পথের বাধা প্রস্তর শক্ত,

অবিরাম যাত্রার চির সংঘর্ষে
একদিন সে পাহাড় টলবেই।
চলবেই, চলবেই
আমাদের সংগ্রাম চলবেই।

' আমার কাছে, এ বাংলায় আমার কালের সকল মানুষের কাছে এ এক দুর্লভ অভিজ্ঞতা।

নরপশুর দল, তোমাদের কাছেও আমার কৃতজ্ঞতার অবধি নেই। তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ক'রে আমাকে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াবার, সাড়ে সাত কোটি মানুষের সংগ্রাম-সাথী হবার সুযোগ ক'রে দিয়েছ। নিপীড়িত মানবাত্মার যে সেবাব্রত নিয়ে রাষ্ট্রসংঘ নামক বিশ্বজাতি মহাসভার পতাকাতলে সমবেত হয়েছি, সে ব্রত পূর্ণ করবার মহালগ্ন যখন এলো তখন তোমাদের কুচক্রী দোসরদের কাল-হরণের দুষ্ট কৌশলে জড়িয়ে পড়বার আগেই তোমরা আমাকে আঘাত ক'রে সে আঘাত প্রবল পরাক্রমে ফিরিয়ে দেবার অধিকার দিয়েছো। তাই তোমাদের ধন্যবাদ জানাই।

পঁচিশে মার্চের সেই বীভৎস রাত্রির পর থেকে দীর্ঘ আট মাস, প্রতিটি দিন। প্রতিটি রাতকে তোমরা রক্তরঞ্জিত করেছো, কলঙ্কিত করেছো। অতি আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে আপাদমস্তক সজ্জিত তোমাদের হার্মাদ বাহিনী সেই-যে সেদিন রাতের অন্ধকারে পূর্ববাংলার নিরস্ত্র মানুষের ওপর অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পয়েছিলো, তারপরের আট মাসের ইতিহাস গণহত্যার ইতিহাস, মেয়েদের ওপর পাশবিক অত্যাচারেব ইতিহাস, লুটতরাজ আর অগ্নিসংযোগের ইতিহাস, সোনার বাংলাকে শ্মশানে পরিণত করার ইতিহাস। সীমান্তের ওপার থেকে অসহায় মানুষের বুকফাটা আর্তনাদ শুনেছি প্রতিদিন। কতো জনপদ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, গলিত শবের গন্ধে আর ধর্ষিতা নারীর আকুল হাহাকারে বাতাস হয়েছে ভারাক্রান্ত। কিন্তু কিছুই করতে পারিনি, এপারের সীমান্তটা পথ আগলে দাঁড়িয়েছিলো। কিছুই করতে

পারিনি, রাজনীতির বাধ্যবাধকতা আমাকে অকর্মণ্য ক'রে রেখেছিলো।
কৃতান্তের উদ্যত খড়্গের বিভীষিকা চোখে-মুখে নিয়ে এক কোটি
নিঃসম্বল মানুষ ভিটেমাটি ছেড়ে এসে আমাদের কাছে আশ্রয় নিলেন,
তাঁদের পরিচর্যার জন্যও কিছুই আমরা করতে পারিনি। আমাদের
অপারগতা দু'বেলা উঠতে বসতে আমাদেরই ভর্ৎসনা করেছে।
নিজের অসহায়তায় গুমরে গুমরে কেঁদেছি আর ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা
করেছি: এই হত্যার উৎসব বন্ধ হোক। এই নারকীয় তাণ্ডব থেকে
জঙ্গীশাহীকে নিবৃত্ত করবার জন্য পৃথিবীর রাষ্ট্রনেতাদের কাছে আমরা
বহু আবেদন জানিয়েছি, নরকের জীবগুলোকে ব্যারাকে ফিরিয়ে
নিয়ে গিয়ে পূর্ববাংলার অবিসম্বাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের
সঙ্গে রাজনৈতিক আলোচনায় বসবার জন্য পাকিস্তান রাষ্ট্রের
জঙ্গীনায়কদের কাছে বারংবার অনুনয়-বিনয় করেছি,-বর্তমান শতাব্দীর
নৃশংসতম পৈশাচিকতার বিরুদ্ধে বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির সক্রিয়তার জন্য
অপেক্ষা করেছি প্রায় আট মাস। কিন্তু আমাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে,
ব্যথিত বিস্ময়ে দেখেছি, বেশীর ভাগ রাষ্ট্রই জঙ্গীশাহীর মারণ-যজ্ঞের
প্রতি উদাসীন থেকে পরোক্ষে হত্যাকারীকেই প্রশ্রয় দিয়েছেন।

তারপর পরিস্থিতির দ্রুত রূপান্তর ঘটেছে। ঘাতকের মুখে
ত্রাসের ছায়া ঘনিয়ে এসেছে। নির্যাতিত বাংলাদেশের বুকচিরে
বেরিয়ে এসেছে হাজার হাজার বীর মুক্তিসেনানী। মুক্তি যুদ্ধের
ইতিহাসে ভিয়েৎনামের পর আর একটি নাম যুক্ত হয়েছে: বাংলা-
দেশ। ছাত্র, শিক্ষক, শ্রমিক, কৃষক, শিল্পী, সাহিত্যিক, এঞ্জিনীয়ার,
অজ্ঞ, বিজ্ঞ, স্ত্রী, পুরুষ, হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ—সকলকে
নিয়েই গড়ে উঠেছে বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনী। প্রত্যেক মুক্তি যোদ্ধার
প্রতিজ্ঞা-কঠিন মুখে লেখা ছিলো সুকান্তর কবিতার একটি ছত্র:
বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাঁটি বুঝে নিক দুর্বৃত্ত। বুঝতে তাদের দেরি
হয়নি। জলে স্থলে মুক্তিবাহিনীর অতর্কিত ঝটিকা-আক্রমণে বাংলা
দেশে পাকবাহিনী যখন ব্যতিব্যস্ত, তখন আন্তর্জাতিক মুরুব্বীদের

কুমন্ত্রণায় পাকিস্তানের সামরিক শাসন কর্তা ভারতকে সর্বাত্মক যুদ্ধে আহ্বান করলেন। কিন্তু বিধি বাম। বিশ্বজাতি মহাসভায় তাঁর মুরুব্বীদের চক্রান্ত বারবার ব্যর্থ ক'রে দিলেন সোভিয়েট দেশ, সম্মুখ সমরে ভারতীয় জওয়ান ও মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে শোচনীয় পরাজয় বরণ ক'রে শেষ যুদ্ধের সাধ মেটালেন পাকিস্তানের জবরদস্ত জঙ্গী প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান আর পূর্ব পরিচয় পালটিয়ে পূর্ব সীমান্তে গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ নামে যে নবীন রাষ্ট্রের অভ্যুদয় হলো তার ললাটে স্বীকৃতির তিলক পরিয়ে তাকে প্রথম স্বাগত জানালো প্রতিবেশী ভারত। এই নবীন বাংলাকে প্রণাম জানাই : তোমাদের যাত্রা শুভঙ্কর হোক, জয় হোক নবজাতকের।

শুরু ও শেষ

নির্মল সেনগুপ্ত

যে পথে এসেছিলেন মার্শাল আইয়ুব খান সেই পথেই এসেছিলেন জেনারেল ইয়াহিয়া খান। যে পথে বিলীন হয়েছিলেন মার্শাল আইয়ুব খান সেই পথেই বিলীন হয়ে গেলেন জেনারেল ইয়াহিয়া খান। কিন্তু মার্শাল আইয়ুব খানের ভাগ্য ভাল, তিনি প্রেসিডেণ্টের গদিতে বসেছিলেন এক দশকের কিছু বেশী, জেনারেল ইয়াহিয়া খানের বরাত মন্দ, তিনি প্রেসিডেণ্টের গদিতে বসেছিলেন মাত্র বছর দুয়েক। দশ বছরই হোক, আর দু'বছরই হোক, দুই সেনাপতি একই পথের পথিক, যে পথে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য নিপীড়িত নির্যাতিত লাঞ্ছিত মানুষের ঘৃণা। একটি ফুল বা এক ফোঁটা চোখের জল নিয়ে কেউ বিদায় জানাতে আসবে না ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত এই সব সেনাপতিদের।

১৯৬৫ সালের যুদ্ধে কাশ্মীর রণাঙ্গনে যে সেনাপতির নেতৃত্বে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ভারতের বিরুদ্ধে প্রথম আঘাত হেনেছিল, সেই সেনাপতি জেনারেল ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানের সর্বময় কর্তৃত্ব লাভ করেছিলেন ১৯৬৯ সালের পঁচিশে মার্চ। জনতার রোষবহ্নি থেকে বাঁচবার জন্য আইয়ুব খান নিজেই তাঁকে ডেকে এনেছিলেন। আইয়ুব খানের পথই অনুসরণ করেছিলেন ইয়াহিয়া খান। ১৯৫৮ সালে প্রেসিডেণ্ট ইস্‌কান্দার মীর্জাকে উৎখাত করে আইয়ুব খান প্রথমে হয়েছিলেন মুখ্য সামরিক আইন প্রশাসক তারপর তিন সপ্তাহের মধ্যেই নিজেকে ঘোষণা করেছিলেন প্রেসিডেণ্টরূপে। মুখ্য সামরিক প্রশাসক ইয়াহিয়া খান তিন সপ্তাহও অপেক্ষা করেন নি, এক সপ্তাহের মধ্যেই তিনি বসেছিলেন প্রেসিডেণ্টের গদিতে।

আইয়ুব খান গণতন্ত্রকে জবাই করে ক্ষমতা অধিকার করেছিলেন। ইয়াহিয়া খান বলেছিলেন তিনি গণতন্ত্রকে ফিরিয়ে আনবার জন্য এসেছেন, জঙ্গীরাজত্ব কায়েম করা তাঁর উদ্দেশ্য নয়। তিনি গণতন্ত্রকে ফিরিয়ে এনে গণ-প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করে আবার ব্যারাকে ফিরে যাবেন। তার আগে তিনি প্রশাসনের আস্তাবলটা সাফ করে দেবেন।

জঙ্গীনায়কের কণ্ঠে সেদিন গণতন্ত্র প্রীতির কথা একটু অদ্ভুত শুনিয়েছিল বৈকি। কিন্তু আসল চেহারাটা ফুটিয়ে তুলতে তিনি বিন্দুমাত্র বিলম্ব করলেন না। তিনি সংবিধান বাতিল করে দিলেন, আইনসভা ভেঙে দিলেন, যেখানে যত মন্ত্রিসভা ছিল সব খারিজ করে দিলেন, সভাসমিতি শোভাযাত্রা সব নিষিদ্ধ করলেন। সর্বত্র শ্রমিক নেতা ও গণ-নেতাদের বন্দী করা হলো। লাহোর, করাচী, ঢাকা প্রভৃতি শহর-মৃত নগরীতে পরিণত হ'ল। স্বগৃহে অন্তরীণ হলেন শেখ মুজিবুর রহমান ও মৌলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী। গণতন্ত্র হতমান হয়ে মুখ লুকালো পর্দার অন্তরালে।

এমনি করে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান যখন সারা পাকিস্তানে সামরিক শাসনের বজ্রমুষ্টি আঁটতে লাগলেন, তখনও ভারত চেষ্টা করলো পাকিস্তানের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক ফিরিয়ে আনা যায় কিনা। ভারতের প্রতিনিধি শ্রীকেবল সিং পাকিস্তানে গিয়ে স্বাক্ষর দিলেন কচ্ছ চুক্তিতে, যে চুক্তি অনুসারে বিশ্ব আদালতের রায় মোতাবেক কচ্ছের বিস্তৃত অঞ্চল ছেড়ে দেওয়া হল পাকিস্তানকে। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী লিখলেন জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে 'আসুন আমরা চেষ্টা করি আমাদের সম্পর্ক স্বাভাবিক করে তুলতে।'

কিন্তু মীমাংসার পথ মৈত্রীর পথ পাকিস্তানের পথ নয়। জওহরলাল নেহরুর মৈত্রী প্রস্তাব এবং যুদ্ধ বর্জন চুক্তি সম্পাদনের প্রস্তাব বারংবার উপেক্ষা করেছিলেন প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান। ইন্দিরা গান্ধীর মৈত্রী প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করলেন প্রেসিডেন্ট

ইয়াহিয়া খান। ভারত-বৈরিতার পথই পাকিস্তানের একমাত্র পথ একথা বুঝতে বিলম্ব করলেন না প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান। ভারতকে অপমানিত করার প্রতিটি সুযোগের সদ্ব্যবহার করলেন তিনি। কত নীচে নামতে পারে পাকিস্তান, ইয়াহিয়া খান তারই স্বাক্ষর রাখলেন মরক্কোর রাজধানী রাবাতে। জেরুজালেমের আল আক্সা মসজিদ অবমাননার প্রতিবাদ জানাবার জন্য ১৯৬৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মরক্কোতে বসেছিল বিভিন্ন রাষ্ট্রের এক সম্মেলন। ভারতে পাঁচ কোটি মুসলমানের বাস এই দাবীতে ভারত চেয়েছিল সেই সম্মেলনে যোগদান করতে। ইয়াহিয়া খান বিদেশে নিজের প্রতিবেশী রাষ্ট্রকে অপমান করার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করলেন।

এমনি করেই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের জঙ্গী হুকুমতের অধীনে পাকিস্তানের জীবন এগিয়ে চললো। ভারতীয় জনগণ তাকিয়ে রইলো পাকিস্তানের দিকে। ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানকে কোন পথে নিয়ে যান তা দেখবার জন্য।

পাক-প্রেসিডেন্ট উদ্যোগী হলেন নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য। ১৯৬৯ সালের ২৮শে জুলাই ইয়াহিয়া খান এক বেতার ভাষণে ঘোষণা করলেন যে, তিনি বিচারপতি আব্দুস সাত্তারকে নিয়োগ করেছেন নির্বাচন পরিচালনার জন্য। মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার সাত্তারের প্রথম কাজ হবে নির্বাচক মণ্ডলীর তালিকা প্রস্তুত করা, ভোটাধিকারী হবেন প্রতিটি প্রাপ্ত বয়স্ক নাগরিক, অর্থাৎ এক মাথা এক ভোট। পাকিস্তানের মোট ১২ কোটি মানুষের শতকরা ৫৬ ভাগ হলেন পূর্ববাংলার মানুষ। প্রেসিডেন্টের ঘোষণায় প্রস্তাবিত জাতীয় পরিষদে পূর্ববাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠতা সুনিশ্চিত হলো। বিস্মিত হলেন পাকিস্তানের মানুষ, আরও বিস্মিত হলেন পূর্ববাংলার মানুষ। ভারত তথা বহির্বিশ্বের মানুষও কম বিস্মিত হলেন না।

এমনি করেই পাকিস্তানের দিগন্তে নূতন আশা সঞ্চারিত হলো। দেখতে দেখতে ১৯৬৯ সাল কেটে গেল। ১৯৭০ সালের ২৮শে মার্চ।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বেতার ঘোষণায় জানালেন, পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত হবে ৩১৩ জন সদস্যের জাতীয় পরিষদ। সেই পরিষদই রচনা করবে অসামরিক সংবিধান। সবাই সবাইকে প্রশ্ন করতে লাগলো, পাকিস্তান কোন পথে?

পাকিস্তান কোন পথে সে কথা প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান যেন নিজেই বলে দিলেন। নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ অসামরিক সংবিধান তৈরী করবে বটে, কিন্তু জাতীয় পরিষদের সার্বভৌমত্ব তিনি স্বীকার করলেন না। তিনি সর্তপাশে আবদ্ধ করলেন ভাবী জাতীয় পরিষদকে। তিনি বললেন সংবিধান তৈরী করতে হবে ১২০ দিনের মধ্যে, সেই সংবিধান সমগ্র পাকিস্তানের গ্রহণযোগ্য হওয়া চাই, সংবিধানে পাকিস্তানের অখণ্ডতা অক্ষুণ্ণ থাকা চাই। নতুন সংবিধানের ভিত্তি হবে ইসলামিক আদর্শবাদ, রাষ্ট্রের নাম হবে ইসলামিক রিপাবলিক অব পাকিস্তান। সর্বোপরি প্রেসিডেন্ট সার্টিফিকেট দিলে পরই নূতন সংবিধান চালু হবে।

১৯৭০ সালের ২৮শে মার্চের বেতার ঘোষণায় তিনি এক ঢিলে মারলেন অনেক পাখী। তিনি প্রকারান্তরে জানিয়ে দিলেন নির্বাচনই হোক, গণপরিষদই হোক, আর সংবিধানই হোক, সার্বভৌমত্ব থাকবে সেনাবাহিনীর হাতে। শেখ মুজিবুর রহমান এবং তার আওয়ামী লীগের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের ৬ দফা দাবীর জবাবটাও তিনি দিয়ে দিলেন এই সঙ্গে। পূর্ববাংলার মানুষ ইয়াহিয়ার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন, কিন্তু বাইরে তা প্রকাশ হতে দিলেন না। নূতন নির্বাচনের সম্ভাবনায় সমগ্র বাংলাদেশে সৃষ্টি হলো বিপুল উদ্দীপনা বিপুল উত্তেজনা। বঙ্গবন্ধুর বার্তা গিয়ে পৌঁছুল শহরে বন্দরে নগরে গ্রামে গঞ্জে হাটে মাঠে ঘাটে। জনগণ অন্তরের সঙ্গে বিশ্বাস করলেন শেখ সাহেব নৌকো পাঠিয়েছেন বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবার জন্য (আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রতীক "নৌকা")।

ইতিমধ্যে ঝড় এলো দিগন্ত ছাপিয়ে। পূর্ববাংলার সুবিস্তৃত উপকূলবর্তী অঞ্চলে আছড়ে পড়ল প্রচণ্ড সামুদ্রিক ঝড়। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনলীলা সাঙ্গ হলো। পিকিঙে মন্ত্রণা আঁটতে ব্যস্ত রইলেন প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়া খান; দুর্গত জনগণকে উদ্ধারের জন্য হেলিকপ্টার এগিয়ে এলো না পশ্চিম পাকিস্তান থেকে, ইসলামাবাদের জঙ্গী শাসকগোষ্ঠী তাকিয়ে রইল অন্যদিকে। ভারত তার বিমান, হেলিকপ্টার এবং ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে নিজে এগিয়ে যেতে চাইলো বাংলাদেশে। কিন্তু জঙ্গীশাসকচক্র রাজী হলো না তাতে। পূর্ববাংলার মানুষ মরে যাক, তবু ভারতকে যেতে দেওয়া হবে না সেখানে। এক কোটি টাকার সাহায্য বরাদ্দ করা ছাড়া ভারতের আর কিছুই করার রইলো না। পিকিং থেকে ফিরে এসে ইয়াহিয়া খান পূর্ববাংলায় সামান্য কিছু কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন করে ফিরে গেলেন ইসলামাবাদে। বাংলাদেশের মানুষের বুকে অবরুদ্ধ বিক্ষোভ গুমরে গুমরে উঠতে লাগলো।

যে নির্বাচন ৫ই অক্টোবর হবার কথা ছিল, ঝড়ের দরুণ তা পিছিয়ে গেল একবার। আরও পিছিয়ে দেবার চেষ্টা করলেন ইয়াহিয়া সরকার। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ দাবী করলেন নির্বাচন আর পিছিয়ে দেওয়া চলবে না। শেষ পর্যন্ত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো ১৯৭০ খৃষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর। বাংলাদেশের জীবনে সেই দিনটি ছিল বড় গর্বের দিন, বড় প্রত্যাশার দিন। তাদের প্রথম প্রত্যাশা পূর্ণ হয়েছিল আওয়ামী লীগের বিপুল বিজয়ে। আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদে লাভ করল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা। তাঁরা স্বয়ংশাসনের অধিকার পাবেন। প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়া খান ও গর্ব করে বললেন, দুনিয়া তাকিয়ে দেখুক পাকিস্তানেও সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক নির্বাচন সম্ভব, কোনও অসতর্ক মুহূর্তে তাঁর মুখ দিয়ে একথাও বেরিয়ে গেল যে, শেখ মুজিবুর রহমানই পাকিস্তানের ভাবী প্রধানমন্ত্রী।

তারপর এলো সেই মার্চ মাস, ১৯৭১ সালের অভিশপ্ত সেই মার্চ

মাস। পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে পূর্ববাংলা তথা আওয়ামী লীগের প্রাধান্য, শেখ মুজিবুরের প্রধানমন্ত্রী হবার সম্ভাবনা, আওয়ামী লীগের ৬ দফা কর্মসূচী চঞ্চল করে তুলল পশ্চিম পাকিস্তানের জঙ্গীবাদী-পুঁজিবাদী-আমলাতন্ত্রী মহলকে। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে জুলফিকার আলি ভুট্টো পদে পদে বাধা সৃষ্টি করতে লাগলেন জাতীয় পরিষদ আহ্বানের পথে। তিনি খোলাখুলি বলতে লাগলেন, আওয়ামী লীগের সংখ্যাগরিষ্ঠতার কাছে তিনি নতি স্বীকার করবেন না। শেখ মুজিবুর রহমান বললেন, পরিষদের ছোট বড় সকল দলের অভিমতকেই তিনি আমল দেবেন। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানী রাজনৈতিক আমলাতন্ত্রী এবং জঙ্গীবাদী মহলের উষ্ণতা ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে লাগলো। পাকিস্তানী ফৌজ বন্দুক হাতে মেসিনগান হাতে রাজপথে নেমে এলো। নির্বাচন-বিজয়ী জনতা অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে তার প্রতিরোধ করার জন্য রুখে দাঁড়ালেন এবং আসমরিক শাসনে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করতে লাগলেন। পাকিস্তানী ফৌজ মেসিনগান চালালো নিরস্ত্র জনতার ওপর। শেখ মুজিবুর রহমান বললেন, সামরিক আইন তুলে নিতে হবে অসামরিক শাসন প্রবর্তন করতে হবে, সৈন্যদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে হবে এবং হত্যার তদন্ত করতে হবে। তা নইলে কোনও আপোষ নেই। পিছিয়ে গেল জাতীয় পরিষদের ২৫শে মার্চের প্রস্তাবিত নির্বাচন।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ঢাকায় এলেন। জঙ্গীশাহীর নতুন ব্রিফ নিয়ে সঙ্গে এলেন শকুনি ভুট্টো। পুরো দশটি দিন ধরে চললো শেখ মুজিবের সঙ্গে ইয়াহিয়া খানের জোর আলোচনা। জগৎবাসী জানলো আলোচনা প্রায় সাফল্যের মুখে। সারা পৃথিবী উদগ্রীব হয়ে রইলো চূড়ান্ত খবর শোনার জন্য।

চূড়ান্ত খবর এলো। কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত খবর। আলোচনা ব্যর্থ হয়ে গেছে। ইয়াহিয়া এবং ভুট্টো গভীর রাতের অন্ধকারে ঢাকা থেকে গা-ঢাকা দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে চলে গেছেন। রেখে গেছেন

মিলিটারী গভর্ণর টিক্কা খানকে। পঁচিশে মার্চের মধ্য রাত্রে টিক্কা খানের ফৌজ সারা পৃথিবীকে বুঝিয়ে দিল যে, তাদের সঙ্গে পশুর কোনও প্রভেদ নেই। একটানা নয় মাস ধরে চললো অসংখ্য হত্যা, অফুরন্ত রক্তপাত, নির্যাতন নিপীড়ন ধর্ষণ এবং লক্ষ লক্ষ মানুষের বাস্তুত্যাগ।

বঙ্গবন্ধু বন্দী হলেন। যাবার আগে তিনি বলে গেলেন, 'এ সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এ সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। সাড়ে সাত কোটি মানুষেরে তোমরা দাবায়ে রাখতে পারবা না।' সংগ্রামীরা তৈরী ছিলেন ঘরে ঘরে। তাঁরা বেরিয়ে পড়লেন পথে পথে, ছড়িয়ে পড়লেন দূর দূরান্তরে। তাঁরা ঘোষণা করলেন, স্বাধীনতা চাই, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা, তার একটুও কমে রাজী হবেন না তাঁরা। বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী সম্মুখ সমরে আহ্বান করলেন পাকিস্তানী ফৌজকে। পাকিস্তানী ফৌজ মরিয়া হয়ে ভারতসীমান্ত আক্রমণ করল। ভারতীয় বাহিনীও রুখে দাঁড়ালো।

তারপর একটার পর একটা দৃশ্য যেন ছায়াছবির মতোই তড়িৎ গতিতে এগিয়ে চললো। ভারত সরকার অকুণ্ঠ সমর্থন জানালেন মুক্তি সংগ্রামীদের। পাকিস্তানী বিমান বাহিনীর অতর্কিত আক্রমণে পশ্চিম সীমান্তে জোর লড়াই শুরু হ'ল তেসরা ডিসেম্বর থেকে। চৌঠা ডিসেম্বর পাকিস্তান যুদ্ধ ঘোষণা করল ভারতের বিরুদ্ধে। ৬ই ডিসেম্বর ভারত সরকার স্বীকৃতি দিলেন বাংলাদেশ সরকারকে। সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তান কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করলো ভারতের সঙ্গে। তারপর একটানা চৌদ্দ দিন ধরে যুদ্ধ চলল পূর্ব ও পশ্চিম রণাঙ্গনে। ১৬ই ডিসেম্বর ঢাকায় পাকিস্তানী ফৌজ আত্মসমর্পণ করলো, ঐ দিনই সন্ধ্যাবেলায় ভারত সরকার যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করলেন পশ্চিম রণাঙ্গনে।

দেখতে দেখতে যেন নিমেষের মধ্যে কত কিছুই ভেসে চলে গেল। ভেসে গেল পাকিস্তান, ভেসে গেল তার সেনাবাহিনী, তারই সঙ্গে

ভেসে চলে গেলেন ক্ষমতা-মদ-গর্বী পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট জেনারেল আগা মহম্মদ ইয়াহিয়া খান সাহেব। অল্প কিছুদিন আগেও যিনি ছিলেন বিপুল ক্ষমতার অধিকারী, আজ তিনি ধিককৃত, কলঙ্কিত। পাকিস্তানে মানুষ আজ তাঁর বিচার চায়।

জানি না, তাঁর জন্য কারাকক্ষের দ্বারী অপেক্ষা করে আছে কি না। যেখানে যে ভাবেই তাঁর গতি হোক না কেন, কোনো অবসন্ন সন্ধ্যায় তিনি ইচ্ছা করলে হয়তো এই সান্ত্বনাটুকু পেতে পারবেন যে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ত্বরান্বিত হয়েছে নাদির শাহের বংশধর ইয়াহিয়া খানের জন্যই।

সমাপ্ত